দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

মানহায আর্কাইভ-২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

শায়খ মাকদীসীর একটি বইয়ের পর্যায়ক্রমিক অনুবাদ ৫

১ম পর্ব ৫

২য় পর্ব ৭

৩য় পর্ব ৯

৪র্থ পর্ব ১০

কোন আক্বীদার ভিত্তিতে ঐক্য ? ১৩

"খিলাফাহ কায়েমের চেষ্টা দিবাস্বপ্ন" - জনৈক কওমি 'আলিম' ।। দালিলিক খণ্ডন !! ১৭

কেন আমি আল কায়েদাকে বাছাই করলাম (Why I Choose Al-Qaeda) ২২

মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত দেশসমূহের জনসাধারণকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো: ৪০

শাইখ আনোয়ার আল-আওলাকি (রাহিমাহুল্লাহ) ৪০

কেনো আল কায়েদা-তালেবান ইসরাইল হামলা করছে না...??? ৫৪

গুলশান-হত্যাকাণ্ড: মাসিক আলকাউসার পত্রিকা এবং কিছু কথা ৫৯

প্রতিশোধকামী উম্মাহর প্রতি কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বার্তা ৬৭

হক্বের অতীত বর্তমান..... ..... ৭৪

জিহাদ কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল নয় ৭৭

বিশুদ্ধ মানহাজ পেইজ থেকে – . দ্বীন ইসলামের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আগে শিখবো। ৮০

জিহাদ বিকৃতির স্বরুপ... আশা করি জিহাদকে কীভাবে বিকৃত করা হচ্ছে তা বুঝার জন্য লেখাটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ* ৮৫

জঙ্গিবাদের অভিযোগ থেকে কখন আপনি মুক্ত হবেন?- উস্তাদ আহমাদ নাবিল হাফিজাহুল্লাহ ৯১

প্রজা তার রাজার ধর্মই গ্রহন করে ১০২

আরবের আলেমগণ কি মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধী ? ১০৪

এ দ্বীন তাত্বিকতার না, এ মানহাজ নিস্ক্রিয়তার মানহাজ না ১১৯

শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জামের ৩০ বছরের দাওয়াতী জিবনের সারসংক্ষেপ ।। মুল্যবান নাসিহাহ ১৩২

শায়খ মাকদীসী র একটি বইয়ের পর্যায়ক্রমিক অনুবাদ

আওলাকীর শিষ্য

Junior Member

০৪-১২-২০১৬

হালের মুরজিয়াদের তৈরি সংশয় অপনোদনের দ্বারা পাঠকের দৃষ্টিনন্দন

১ম পর্ব

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থণা করি, এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাই আমাদের নফসের ক্ষতি ও খারাপ আমল থেকে। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ ভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি ভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

অতঃপর...
এই কয়েকটি পৃষ্ঠা, যার মূল অংশ আমি লিখেছিলাম নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (তাঁর উপর সর্বোত্তম সালাত ও পূর্ণ সালাম বর্ষিত) ১৪০৮ হিজরীর মুহাররম মাসে। আর সেটি এই পুস্তিকার নামে উল্লিখিত বিষয়টি নিয়েই লিখেছিলাম, তবে সেটি সংক্ষিপ্ত ছিল এবং তখন এর নাম ছিলঃ

رد الهداة، على من زعم أن ليس في الأعمال والأقوال كفر ما لم يرتبط باعتقاد إلا الصلاة

{যারা বলে "নামায ব্যাতীত অন্যান্য কাজ ও কথার মাধ্যমে কুফরী হয় না যতক্ষণ সেটা বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত না থাকে" তাদের প্রতি হিদায়াত প্রাপ্তদের জবাব}। আর লেখাটি ছিল যারা এধরণের কথা বলে তাদের প্রতি প্রতিউত্তর। ঐসময়ে আমি লেখাটি প্রচার কিংবা ছাপানোর প্রতি গুরুত্ব দেই নি, যদিও পাকিস্তানে আমাদের কিছু ভাই সেটা মুদ্রণযন্ত্রে ছাপিয়েছিল এবং লেখাটি নিয়ে তারা পরস্পর আলোচনা করেছিল এবং মূল লেখার সাথে তারা কিছু অংশ যোগও করেছিল।

অতঃপর বর্তমানে আমি যখন (মুসলিম) দেশগুলোতে হালের মুরজিয়াদের দৌড়াত্ব দেখলাম এবং দেখলাম যে তাদের ফিতনা মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে এবং জনসাধারণের মাঝে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও প্রসারিত হচ্ছে; এমতাবস্থায় আমি এই লেখাটি প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলাম যাতে আমাদের সত্যসন্ধানী ভাইরা জাহমিয়া ও ইরজাপন্থীদের তৈরি সংশয় অপনোদনে লেখাটি দ্বারা উপকৃত হন। সুতরাং আমি মূল লেখাটিতে ফিরে গেলাম(১).. এবং একে পরিমার্জন করলাম এবং মূল বিষয় থেকে দূরবর্তী নয় এমন সংশ্লিষ্ট আরও কিছু সন্দেহের জবাব যোগ করলাম। আর ভবিষ্যতে যদি আরো নতুন সন্দেহ তৈরি হয় এবং প্রসিদ্ধি লাভ করে, তবে সেগুলোর জবাব নতুন একটি খণ্ডে প্রদান করতে আমার কাছে কোন বাধা নেই। যদি হায়াত বাকী থাকে এবং আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক লাভ হয়।

"যদি বিচ্ছা ফিরে আসে, আমিও ফিরে আসব-

আর স্যান্ডেল থাকবে প্রস্তুত।" (কবিতা)

আর আপনি দেখবেন, এই কাজে আমরা কোন শাখাগত বিষয় নিয়ে কথা বলছি না, বরং এটি দীনের মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়। আর এ লেখার দ্বারা আমরা তাদের নিক্ষিপ্ত তীর প্রতিহত করছি যারা সত্যপথ থেকে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যদের পথভ্রষ্ট করছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করি, তিনি যেন আমাদের ইখলাস দাণ করেন এবং তাঁর একত্ববাদী বান্দা ও সৈনিক হিসেবে কবুল করেন। এই তো...

শুরুতে এবং শেষে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর সালাত বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও সমস্ত সাহাবীদের উপর।

আবু মুহাম্মদ আল মাকদীসী

১৪১২ হিজরী

(১) এটা ভাইদের যোগকরা অতিরিক্ত অংশ ব্যাতিরেকে; কারণ সেটা "হাকিমিয়্যাহ" সংক্রান্ত ছিল যা মূল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

২য় পর্ব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অবগত হন! আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন। ইলম ও আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দাবীদার এমন বহু লোকের কাছ থেকে আমাদের কাছে বিভিন্ন বক্তব্য পৌছেছে। যার সারকথা হচ্ছে- এমন কোন কথা বা কাজ নেই যা কোন ব্যাক্তি বললে বা করলে কুফরীতে পতিত হবে যতক্ষণ সে এ কথা বা কাজকে নিজ আকীদার সাথে সংযুক্ত না করবে। তবে তারা নামাযকে এর ব্যাতিক্রম বলে থাকেন... এবং প্রায়ই তারা হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব আল উক্বাইলী (রাঃ) এর এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন: ***মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ নামায ব্যাতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফর মনে করতেন না।*** (তিরমিযী) এছাড়াও তারা দলীল হিসেবে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি ব্যবহার করে থাকেন ***"আমরা কোন গুনাহুর কারণে কোন মুসলিমকে কাফের বলি না যতক্ষণ সে একে হালাল মনে না করবে"***, এবং প্রায়ই তাদের অনেকে এই উক্তিকে মারফু' ও হাদীস আখ্যা দিয়ে থাকেন।

এমনও হয়েছে যে, আমি তাদের কয়েকজনের সাথে আলোচনা করেছি এবং তাদের সামনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি যা তাদের তৈরি করা মূলনীতির বিরূদ্ধে যায় এবং একে খন্ডিত করে দেয়; যেমনঃ (আল্লাহ বা তাঁর রাসুলকে) গালি দেয়া, (দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে) উপহাস করা, কোন মূর্তিকে সেজদা করা ইত্যাদি, তখন তারা বলে ওঠে-

"এসমস্ত কথা বা কাজ আকীদার সাথে সম্পর্ক থাকা ব্যাতীত ঘটা সম্ভব নয়... কারণ গালিদাতা কিংবা উপহাসকারী কিংবা মূর্তিকে সেজদাকারী নিশ্চয়ই তার মনে ভ্রান্ত আকীদা রাখে কিংবা দ্বীন বা দ্বীনের কোন বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে থাকে, যা তাকে গালি, উপহাস কিংবা এ জাতীয় অন্যান্য কাজ করতে প্ররোচিত করে থাকে... সুতরাং এটা (আকীদার কারণে) কুফর, আমল বা কাজের (কারণে) না।"

... তারা কেবল এ নীতির ভিত্তিতেই কোন কাজের উপর কুফরীর হুকুম আরোপ করে থাকে।

অবগত হন! আমি এখানে যে বিষয়টিতে জোর দিচ্ছি তা হচ্ছে তাগুতের কাছে বিচার-মীমাংসা চাওয়া। (তারা বলতে চায়) এ কাজটি করার কারণে কোন ব্যাক্তি কুফরীতে পতিত হয় না যতক্ষণ সে এ কাজটি আল্লাহর বিধান (অনুযায়ী বিচার-মীমাংসাকে) অস্বীকার না করে কিংবা একে হালাল মনে না করবে।

তারা আল্লাহর পাশাপাশি বিধান রচনাকারী যুগের এই সমস্ত তাগুতদের পক্ষ নেয় এবং কুফর বা কুফরের মূলনীতি সম্পর্কে বলে যে, "তাগুতের কাছে বিচার-মীমাংসা চাওয়া, আল্লাহর পাশাপাশি বিধান তৈরি করা, আল্লাহর দ্বীন নিয়ে উপহাস করা, আল্লাহর বিধানকে গালি দেয়া, গায়রুল্লাহর সেজদা ইত্যাদি এই কাজগুলো স্বয়ং কুফর নয় বরং জুহুদ (অস্বীকার) কিংবা ইস্তিহ্*লাল (হালাল মনে করার) কারণে কুফর।

আমার ধারনা ছিল এই বক্তব্যগুলো এতটাই নিকৃষ্ট ও দলীল-প্রমাণ বিহীন যে এটা কেবল কতক গোমরাহ লোকের পক্ষেই বলা সম্ভব। কিন্তু এখন আমাকে দেখছি যে, যাদেরকে আলেম ও দাওয়াতের ময়দানে নেতৃত্বদাণকারী ভাবা হয়, ইতর-ভদ্র সর্বমহলে যাদের দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা হয়, তারা পর্যন্ত এই ধরণের অসুস্থ চিন্তাভাবনা পোষণ করে এবং এগুলো প্রচার ও প্রসার করে থাকে যাতে করে দ্বীনের দুশমন অত্যাচারী মুরতাদ শাসকদের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করা যায়।

একারণেই আমি এই পৃষ্ঠাগুলো লেখা শুরু করেছি যাতে এই সন্দেহ-সংশয়গুলো নিরসন করা যায়। পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত মাওলার কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন একমাত্র তার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই এ কাজ করার তাওফীক্ব দাণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রেষ্ঠ অভিভাবক ও শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

(২) হাকিমও এই হাদীসটি আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং এটি তার পদ্ধতি অনুযায়ী সহীহ।

৩য় পর্ব

অধ্যায়

"মুরজিয়া কারা?" এ সম্পর্কে আলোচনা

মুরজিয়ারা ৩ শ্রেণীরঃ

প্রথম শ্রেণী: যাদের ইরজা ঈমান ও 'ক্বাদার' এর ক্ষেত্রে মুতাযিলা ও ক্বাদারিয়্যা ফেরকার অনুরূপ।

দ্বিতীয় শ্রেণী: যাদের ইরজা ঈমান ও 'জাবর ফিল আ'মাল' এর ক্ষেত্রে জাহমিয়্যা ফেরকার অনুরূপ।

তৃতীয় শ্রেণী: এরা জাবরিয়্যা ও ক্বাদারিয়্যা ফেরকার বাইরের। এশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত অনেক ফেরকা আছে, যেমন: ইউনুসিয়্যা, গাসসানিয়্যা, সাওবানিয়্যা, তাওমানিয়্যা, মুরিসিয়্যা।

তাদের নাম মুরজিয়া রাখা হয়েছে কারণ তারা আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। আর ইরজা অর্থ **التأخير** বা পিছিয়ে দেয়া, বিলম্বিত করা। যেমন (আরবীতে) বলা হয়- **أرجيته وأرجأته** অর্থাৎ আমি একে পিছিয়ে দিয়েছি।

ঈমানের ক্ষেত্রে মুরজিয়ারা আবার ২ প্রকার:

প্রথম: চরমপন্থী মুরজিয়া (কালামশাস্ত্রে পারদর্শী মুরজিয়া)।

দ্বিতীয়: ফিকহবিদদের অন্তর্ভূক্ত মুরজিয়া।[৩]

*** চরমপন্থী মুরজিয়াদের বিষয়টি হচ্ছে-** জাহম বিন সফওয়ান এবং তার অনুসারীরা বলে থাকে: ঈমান আনয়ন করা হচ্ছে কেবলমাত্র ক্বালব বা অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা এবং (ঈমানের বিষয়াদি সংক্রান্ত) জ্ঞান অর্জন করার নাম। তারা অন্তরের কাজকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত করে না। তারা ধারনা করে একজন মানুষ শুধুমাত্র অন্তর দ্বারাই কামেল ঈমানদার হয়ে যায়, যদিও সে এর পাশাপাশি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে গালি দেয়, আল্লাহর বন্ধুদের বিরূদ্ধে শত্রুতা করে, মসজিদ ধ্বংস করে, কুরআনের মাসহাফ কিংবা মুমিনদের চূড়ান্ত অবমাননা করে, কাফেরদের চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্মান করে। জাহম বিন সফওয়ান ও তার অনুসারীরা বলে: এ

সবগুলো কাজই গুনাহ, তবে ঈমানের বিপরীত নয়। কারণ ঈমান থাকে অন্তরে। বরং সে এ কাজগুলো করার পরেও বাতিনী বা অভ্যন্তরীনভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন মুমিন।

তারা বলে: এই ব্যাক্তির উপর দুনিয়াতে কাফেরের অনুরূপ হুকুম সাব্যস্ত হবে, যেহেতু এ কথাগুলো কুফরের লক্ষণ (তবে স্বয়ং কুফর নয়)।

(৩) এখানে তৃতীয় একটি প্রকারও আছে যারা বলে ঈমান হচ্ছে শুধুমাত্র মুখে উচ্চারিত কথা, কাররামিয়্যা ফেরকা ব্যাতীত অন্য কেউ এমনটি বলেনি।

৪র্থ পর্ব

কিন্তু যখন তাদের সামনে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা' দ্বারা দলীল পেশ করা হয় যে, সত্ত্বাগতভাবে উল্লিখিত (প্রতিটি কাজই কুফর এবং এরা) প্রত্যেকেই কাফের যাদেরকে আখিরাতে শাস্তি প্রদান করা হবে, তারা বলে: এগুলো হচ্ছে অন্তর দ্বারা সত্যয়ন না করা কিংবা ইলম না থাকার দলীল। কেননা তাদের কাছে কুফর হচ্ছে একটি বিষয়- অজ্ঞতা, এবং ঈমানও একটি ইলম (জ্ঞান) অথবা কুফর হচ্ছে অন্তর দ্বারা অস্বীকার করা এবং ঈমান হচ্ছে অন্তর দ্বারা সত্যয়ন। তাদের নিজেদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে যে, অন্তরের সত্যয়ন এবং ইলম কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন।

এহেন বক্তব্য ঈমান সম্পর্কে ব্যক্ত সবচেয়ে বিকৃতিপূর্ণ বক্তব্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ কালাম শাস্ত্রবিদ মুরজিয়া এ মত পোষণ করে থাকে। সালাফগণ এ কথা যারা বলে থাকে তাদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন, যেমন: ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ, আহমাদ বিন হাম্বল, আবু উবায়দ। তারা বলেন: কুরআনের নস (text, লিখিত বক্তব্য) দ্বারা প্রমাণিত যে ইবলিস কাফের, অথচ তার কুফরের কারণ তার অহংকার এবং আদমকে সেজদা না করা; কোন খবরকে অস্বীকার করা নয়। একইকথা ফির'আওন ও তার গোত্রের ব্যাপারে, যেমন: আল্লাহ বলেন,

{وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً} "অন্যায় ও অবাধ্যতার কারণে তারা (নিদর্শনসমূহ) অস্বীকার করলেও তাদের অন্তরগুলো একে নিশ্চিতরূপে

বিশ্বাস করেছিল।" [সুরা নামল: ১৪], মুসা আলাইহিস সালাম ফির'আওনকে বলেছিলেন, {لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر} **"তুমি অবশ্যই জান প্রমাণাদি হসেবে এই (নিদর্শনগুলো) আসমান ও জমীনের রব্ব ব্যাতীত অন্য কেউ নাযিল করে নি।"** [সুরা ইসরা: ১০২]।

দেখুন! মুসা যিনি কিনা 'আস সাদিক্কুল মাসদুক্ব' (সত্যবাদী এবং আল্লাহ কর্তৃক সত্যায়িত) তিনি ফির'আওনকে এ কথা বলছেন! সুতরাং এটাই প্রমাণ যে ফির'আওন জানত এই আয়াত ও নিদর্শনসমূহ আল্লাহ নাযিল করেছেন, এরপরেও সে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় অবাধ্য ও বিদ্রোহী ছিল তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ফাসাদ বা ভ্রান্তির কারণে, ইলম না থাকার কারণে নয়। আল্লাহ বলেন, { إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين} **"নিশ্চয়ই ফির'আওন জমীনে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং এর অধিবাসীদের শ্রেণীবিভক্ত করেছিল, তাদের একটি শ্রেনীকে সে হীনবল করেছিল, তাদের পুত্রদের জবাই করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল।"** [সুরা কাসাস: ৪]

একইভাবে আল্লাহ ইহুদীদের ব্যাপারে বলেছেন: { الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} **"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে) এমনভাবে চিনে যেমনভাবে তারা নিজ পুত্রদের চিনে।"** [সুরা বাকারাহ: ১৪৬]

এমনিভাবে মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন:

{فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون} **"প্রকৃতপক্ষে তারা আপনাকে অস্বীকার করে না, বরং (এই) অত্যাচারীরা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকেই প্রত্যাখ্যান করে।"** [সুরা আন'আম: ৩৩]

*** ফুকাহা বা ফিকহবিদদের অন্তর্ভুক্ত মুরজিয়াদের বিষয় হচ্ছে:**

তারা বলে থাকে ঈমান হচ্ছে অন্তর দ্বারা সত্যায়ন, জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ তবে কাজ বা আমল ঈমানের অন্তর্ভূক্ত নয়। কুফা অধিবাসী একদল ফুকাহা ও আবেদ এই মতের অনুসারী ছিল। তাদের এই বক্তব্য (জাহমিয়্যা ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা) জাহম

বিন সফওয়ানের অনুরূপ নয় কেননা তারা স্বীকার করে একজন মানুষ মুমিন হতে পারবে না যদি সে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মুখে ঈমানের স্বীকৃতি না দেয়, তারা আরও স্বীকার করে তাসদীক্বুল ক্বালব বা অন্তরের সত্যায়ন সত্ত্বেও ইবলিস, ফির'আওন প্রমুখ কাফের। কিন্তু যেহেতু তারা কাজ বা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত করে নি সেহেতু জাহমের ব্যাপারে প্রদত্ত বক্তব্য তাদের উপরও আরোপিত হবে। তারা এও বলে না যে আমলের মাধ্যমে ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে, বরং তারা বলে ঈমানের বৃদ্ধি কেবল শরীয়ত পূর্ণ হওয়ার আগে ঘটত; এটা এই অর্থে যে যখনই আল্লাহ কোন আয়াত নাযিল করতেন তখনই তাকে সত্যায়ন করা জরুরী হয়ে যেত এভাবে পূর্বে কৃত সত্যায়নের সাথে নতুন সত্যায়ন যোগ হওয়ার মাধ্যমে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেত। কিন্তু আল্লাহ যখন (কুরআন) নাযিল পরিপূর্ন (তথা সমাপ্ত) করলেন, তখন তাদের মতে ঈমানের মধ্যে পার্থক্য করার (তাফাদ্বুল) অবকাশ থাকে নি, বরং সমস্ত মানুষের ঈমান সমান। হোক তা প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর সাহাবী যেমন: আবু বকর ও উমারের ঈমান কিংবা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আবু মুসলিম খুরাসানী ও তাদের মত পাপিষ্ঠতম লোকদের ঈমান।[৪]

(৪) শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যার লেখা কিতাবুল ঈমান থেকে সংগৃহিত ও সংক্ষেপিত।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৩৫০

কোন আক্বীদার ভিত্তিতে ঐক্য ?

Shabab Abdullah

Member

০৫-২৩-২০১৬

মুসলিমদেরকে ইসলাম এক করে কালিমাতুত তাওহীদ 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে। দ্বীন ইসলামের মৌলিক আক্বীদার কিছু বিষয়াবলি যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রাপ্ত, যা তারা অন্তরে বিশ্বাস করে যবান দিয়ে উচ্চারন করে কাজে পরিনত করে দেখিয়েছেন- এই তাওহীদের দ্বারাই উম্মাহ একীভূত হবে। এই তাওহীদ থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই তার সাথে ঐক্য অসম্ভব।

তাওহীদের শরাহ করতে গিয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামা গন আক্বীদার কিতাব লিখেছেন, সময়ে সময়ে তাদের কৃত ব্যাখ্যায় শব্দগত ভাবগত অর্থগত টুক টাক মতভেদ করেছেন। সর্বজনস্বীকৃত বাতিল ফেরকাগুলোকে বাদ দিলে তাওহীদের আক্বীদার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা মুসলিম উম্মাহর মাঝে তিনটি প্রধান মাসলাক দেখতে পাই-

১। আসারিগন যারা আক্বীদার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসিনগন এবং ইমাম আহমদের অনুসারী।
২। আশআরীগন যারা ইমাম আবুল হাসান আল আশআরী ও তার ছাত্রদের আক্বীদার অনুসারী।

৩। মাতুরিদীগন যারা ইমাম আবুল মানসুর আল মাতুরিদীর আক্বীদার ভাষ্যের অনুগামী।
সুস্থ বিবেক, নিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং সৎ নিয়ত নিয়ে এই তিনটি মাসলাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, আক্বীদার কিছু ফুরুঈ বিষয়ে এখানে পার্থক্য থাকলেও তাওহীদের মজ্জা অভিন্ন। মানে আমরা সহজে বলতে পারি টুক টাক পার্থক্য যা থাকার তা আছে আক্বীদার বিশ্লেষনে কিন্ত তাওহীদের ব্যাপারে সকলেই একমত। সাহাবায়ে কেরামের যুগে আক্বীদার সূক্ষ্য থেকে সূক্ষ্য বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠেনি, তাই সেগুলোর ব্যাখ্যা বা তা নিয়ে কিতাব লেখারও দরকার হয়নি। মূলত তাওহীদ তো সেই সহজবোধ্য ও সহজগম্য অনুধাবনযোগ্য ধারনা যা শিক্ষিত

অশিক্ষিত সকলের বুঝে ধরে যাতে ইলমের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকলেই এক আল্লাহর খালেস বান্দা হয়ে যেতে পারে। রঈসুল মুফাসসিরীন ইবনে আব্বাস(রা) যে তাওহীদের উপর ছিলেন আফরার পুত্র মুয়ায-মুওয়াব্বিয(রা) ও সেই একই তাওহীদ মেনেছেন। আবু হুরাইরা(রা) এর তাওহীদ আর উসায়রীম(রা) এর তাওহীদ ছিল অভিন্ন। এজন্যে রাসূল(স) কোন ক্বওমে দাওয়াত দিতেন খুবই সাবলীল ও ব্যাপক কথার দ্বারা, সাহাবায়ে কেরামও এই আদর্শ ধরে রেখেছেন। পরবর্তীতে বাতিল ফেরকাগুলোর(জাবরিয়া-কাদরিয়া-মুশাব্বিহা-মুতাযিলি-খারেজি-রাফেযি-বাতেনি-উবাইদি-জাহমি ইত্যাদি প্রাচীন ফেরকা এবং কট্টর বেরেলভি-আগাখানী-মডার্নিস্ট-আহলে কুরআন-কাদিয়ানি-পশ্চিমা মডারেট ইত্যাদি নতুনতর ফেরকা) মোকাবেলায় আলেমগন বিভিন্ন সময়ে নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন শরাহ, তাফসীর, তা'বীল এর আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকে হয়ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে কিছু তাহরীফ, তা'তীল, তাজসীম, তাবদীল বা তামসিল করে ফেলেছেন। যা হোক, আহলুসস সুন্নাহ তার সলফে সালেহীনগনের পথে চলে, সেখান থেকে সকল ভালো জিনিস গ্রহন করে এবং সকল খারাপ জিনিস বর্জন করে। ইলমী আলোচনা উদ্দেশ্য না এখানে, তার জায়গাও এটা না। ব্যবহারিক কিছু উদাহরন দিয়ে বিষয়টা খোলাসা করার চেষ্টা করি।

উম্মাহর ঐক্যের জন্যে বর্তমানে এই তিন গোত্রে সম্মিলন ও একত্রীকরন কতটা জরুরী? সালাফিদের মধ্যে অনেকেই আশআরী ও মাতুরিদিদের নিয়ে নিতান্ত বাড়াবাড়ি করে থাকেন। আবার আশআরী মাতুরিদিদের মধ্যে অনেকে সালাফিদের গোমরাহ বলতে দ্বিধা করেন না। দিনশেষে নিজেদের মাঝে কোন্দলের সুযোগে শয়তানের প্রতিনিধি কাফের-ত্বাগুত চক্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। যখনই ঐক্য শব্দটা উচ্চারিত হয়, মনের অজান্তে যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে তা হলো জিহাদের ময়দান। সব প্রেক্ষাপটের মত বর্তমান সময়ে আক্বীদার ভিত্তিতে উম্মাহর ঐক্যের নজিরও স্থাপিত হয়েছে এই ময়দানেই।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের প্রারম্ভে শায়খ বিন বায ও শায়খ ইবন উসায়মীনের মত সুউচ্চ মাকামের সালাফি আলেম মাতুরিদি আফগানীদের সমর্থনে ফাতাওয়া ও কিতাবাদি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে আফগানিস্তানে যখন তালিবান শাসিত সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন আমিরুল মু'মিনীন মুল্লাহ মুহাম্মদ

উমার(রহ) এর নিকট বায়াত বদ্ধ হন আরবের বিখ্যাত তিনজন সালাফি আলেম; শায়খ হামুদ আল উক্বলা আশ শুয়াইবি, শায়খ আলি আল খুদাইর, শায়খ সুলাইমান আল আলওয়ান। এই তিনজন আলেম আক্বীদায় প্রচন্ড ভাবে আসারি, তাদের উস্তাদরাও আসারি, তাদের সাগরিদরাও। তারা সকলেই জানতেন যে তালিবান প্রধানত একটি মাতুরিদি জামাত। কিন্ত মাসলাকের ভিন্নতার কারনে তারা আমিরের কাছে বায়াত হবার মত মহান এক ইবাদাতকে ত্যাগ করেন নি। তাদের পথ ধরে বায়াত হয়েছেন শায়খ ইউসুফ আল উয়েরি, শায়খ নাসের আল ফাহদ, শায়খ সুলতান আল উতাইবি, শায়খ ফারিস আয যাহরানীর মত বাঘা বাঘা সালাফি আলেমগন। পরবর্তীতে আরো বায়াত হয়েছেন শায়খ আসিম আল মাকদিসী, শায়খ আবু বাসির তারতুসী, শায়খ ইবরাহীম আর রুবাইশ, শায়খ খুবাইব প্রমুখ। এমনকি আশআরী আক্বীদার চরম বিরোধী শায়খ বিশর ইবন ফাহদ, শায়খ আবু ক্বাতাদাও বায়াত প্রদান করেন। আর এই কাতারের মুজাহিদিন উলামার নাম নেয়া শুরু করলে থামা কষ্টকর হবে এনাদের মধ্যে যারা এখনও জীবিত আছেন সকলেই পরবর্তীতে আমিরুল মু'মিনীন মুল্লাহ আখতার মানসুর(হা) এর কাছে নিজের বায়াত নবায়ন করেছেন। আমরা যারা সালাফিয়্যাতের দাবি করি, তারা নিশ্চয়ই এনাদের চেয়ে বড় সালাফি না।

আবার আফগান জিহাদের প্রতিটা পর্যায়েই আফগানীদের পক্ষ থেকে প্রবল আবেদন ছিল আরবের আলেমদের এই ভূমিতে আগমনের জন্যে, তাদেরকে দ্বীন ইসলাম শেখানোর জন্যে। সালাফি উলেমাগন আফগানে গিয়ে তাদের অনেক বিদআত দূর করেছেন, অনেক ভূল সংশোধন করে দিয়েছেন। পাশাপাশি নিজেরাও ঐক্যের পথে চলার নতুন সবক পেয়েছেন। আক্বীদাতে ফুরুঈ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মুল্লাহ উমার একজন সালাফি মুজাহিদ উসামা বিন লাদেনকে আপন ভাইর চেয়েও বেশি যত্ন করে প্রতিরক্ষা করেছেন, মাতুরিদি প্রধান জামাত তালিবানের সাথে আসারি প্রধান জামাত আল ক্বায়েদা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে গেছে। সমগ্র তালিবানের আলেমগন একবাক্যে তার এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন, না-হক্বপন্থীরা ছাড়া কেউ এর বিরোধিতা করেননি। আজ পর্যন্ত উম্মাহ এর সুফল ভোগ করছে। যারা নিজেদেরকে মাতুরিদি আক্বীদার সাথে যুক্ত করতে পছন্দ করি, তারা নিশ্চয়ই এই আক্বীদা মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী বা নিজামুদ্দিন শামযাঈর চেয়ে বেশি বুঝি না।

যতদিন পর্যন্ত কেউ তাওহীদের আমালী রূপটা না দেখবে, তার কাছে কিতাবের পাতায় শুধুই মতভেদ দৃষ্টিগোচর হবে। যতদিন না অন্য মতের লোকদের থেকে তাদের ভাষ্যটা জেনে ইনসাফের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ না নিবে, ততদিন পর্যন্ত নিজ গন্ডির বাইরে সবাইকে গোমরাহ মনে হবে। যতদিন না জিহাদের উদ্দেশ্যে ত্বাগুত কাফিরের বিরুদ্ধে নিজেকে খরচ না করবে, ততদিন ঐক্য প্রতিষ্ঠার বানী ঠুনকো ই থেকে যাবে। জুযইয়্যাতকে পাশ কাটিয়ে কুল্লিয়্যাতকে প্রাধান্য যতদিন না দিবে উম্মত, ততদিন কাফিরের পদতলেই থেকে আক্বীদার কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে।

অতএব ঐক্য হবে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের ভিত্তিতে, রাসূলের(স) ইত্তেবার ভিত্তিতে, আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহর ভিত্তিতে, কুফর বিৎ ত্বাগুতের ভিত্তিতে। আম্বিয়া-কিতাব, মালাইকা, কিয়ামাত, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম, সিরাত ইত্যাদি অকাট্য বিষয়ে আক্বীদার শুদ্ধতা ও অভিন্নতা ঐক্যের জন্যে যথেষ্ট। আর নিতান্ত ভ্রান্ত আক্বীদার মুসলিমগন তো আগেই আহলুস সুন্নাহ থেকে বাদ; তবুও তাদেরকে কাফের মুশরিকদের উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং কুফরের মোকাবেলায় তাদের পক্ষে দাড়াতে হবে। আল্লাহ এই উম্মতকে ঐক্যের বারাকাহ দান করুন, আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৯০৫

"খিলাফাহ কায়েমের চেষ্টা দিবাস্বপ্ন" - জনৈক কওমি 'আলিম' || দালিলিক খণ্ডন !

Abu Khubaib

Senior Member

০৫-২২-২০১৬

জনৈক কওমি আলিম "আমরা যারা ইসলামী হুকুমতের দিবা-স্বপ্ন দেখি তাদের জন্য হাদিয়া।" শিরোনামে কিছু দালিল পেশ করে বোঝাতে চেয়েছেন ইমাম মাহাদি (আ) এর আগমনের পূর্বে খিলাফত আসবে না।

(উনার মূল লেখায় যেতে উপরের লাইনে ক্লিক করুন)

উনার প্রথম পয়েন্টঃ ইসলামি হুকুমাত কায়েমের প্রচেস্টা 'দিবাস্বপ্ন"

ওনি ওনার বক্তব্যের স্বপক্ষে আহলুস সুন্নাহ মহান দুই ইমাম, ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার ও ইমাম নববি (রহ) বক্তব্য টেনে এনেছেন।

ইমাম ইবনে হাজার (রহ) এবং ইমাম নববী যদি তা ই বুঝে থাকেন অর্থাৎ ইসলামী হুকুমাত কায়েমের প্রচেষ্টাকে যদি উনারা 'দিবাস্বপ্ন' মনে করে থাকেন, তাহলে উনারা কেন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম ফিরিয়ে আনার দিবাস্বপ্ন নিজেরাই দেখেছেন এবং দিবাস্বপ্ন দেখার স্বপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন, উপরন্তু ওয়াজিব বলেছেন !!!????

১/ ইসলামি হুকুমাতের দিবাস্বপ্ন দেখতে উৎসাহদানকারী ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ)'র বক্তব্য –

ইবনে হাজার (রহঃ) এ ব্যাপারে ইবনে বাত্তাল, ইবনে তীন, দাউদী (রহঃ) সহ অন্যান্যদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন:

وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض

মোট কথা : তাকে তার(শাসক) কুফরীর কারণে অপসারণ করতে হবে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হলো তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে অবহেলা করবে সে হবে **গুনাহগার।** আর যে অক্ষম হবে তার উপর ওয়াজিব হলো ঐ এলাকা থেকে হিজরত করা। (ফাতহুল বারী, কিতাবুল ফিতান, ১৩/১২৩)

তাহলে যে ব্যক্তি অবহেলা করে এবং অবহেলা করার দিকে আহ্বান করে, উপরন্তু দালিল পেশ করে একটি ওয়াজিব দায়িত্বকে ''দিবাস্বপ্ন'' আখ্যায়তি করে তার হুকুম কি হবে?? আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় চাই!! ইমাম সাহেবের বক্তব্য ভুলভাবে পেশ করে আহলুস সুন্নাহ'র এই মহান ইমামের নামে কালেমা লেপনের চেস্টাকারী ব্যক্তির ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলাই করবেন ইনশা'আল্লাহ!

২/ ইসলামি হুকুমাতের দিবাস্বপ্ন দেখার ব্যাপারে ইমাম নববি (রহ)'র বক্তব্য -
আবু হোরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, আবু বকর (রাদিঃ) খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করলেন, এ সময় আরবের অনেক ব্যক্তি কুফরী করলো। তখন উমর (রাদিঃ) বললেন, হে আবু বকর আপনি মানুষদের সাথে কিভাবে কিতাল করবেন? অথচ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি যতক্ষণ না তারা বলে লা-ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)। আর যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তার মাল ও জানকে আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নেবে তবে তার হক্কের কারণে আর তার হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যস্ত।
আবু বকর (রাদিঃ) বললেন: আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিতাল করবো যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো মালের হক্ক। আল্লাহর শপথ তারা যদি এমন একটি ছাগল ছানা দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকে যা তারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো তাহলে এই বিরত থাকার কারণে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। উমর (রাদিঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এটি একারণে হয়েছে যে,আল্লাহতা'আলা কিতালের ব্যাপারে আবু বকর (রাদিঃ) এর বক্ষকে উন্মোচন

করে দিয়েছিলেন। আর আমিও বুঝতে পেরেছি যে এটাই হক্ব। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৫২৬)

ইমাম নববী (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেন:

وفيه وجوب قتال ما نعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أوكثيرا لقوله ﷺ لو منعونى عقالا أو عناقا

এতে এ প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে, যারা যাকাত, নামায অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত থাকে - চাই কম হোক কিংবা বেশী, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। কেননা আবু বকর (রাদিঃ) বলেছেনঃ যদি তারা আমাকে একটা রশি (অপর রেওয়াতে এসেছে) যদি একটা উটের বাচ্চা পর্যন্ত দেয়া থেকে বিরত থাকে (তথাপি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো)। (শরহে মুসলিম লিন নববী,খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২১২)

৩/ ইসলামি হুকুমাত প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্নে বিভোর আল্লামা ত্বকী উসমানী (দাঃ বাঃ) এর ফতওয়া:

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب – والله أعلم – أن فسق الإمام على قسمين:

الأول ما كان مقتصرا على نفسه , فهذا لا يبيح الخروج عليه , وعليه يحمل قول من قال : إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه.

والثاني: ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفر , و إقامة شعائره , وتحكيم قوانينه , واستخفاف أحكام الدين , والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه , وتفضيل شرع غير الله عليه . فهذا ما يلحق بالكفر البواح . ويجوز حينئذ الخروج بشروطه.

“শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ” এ প্রসঙ্গে শরয়ী নুসূস সমূহ এবং মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহাগণের উক্তি সমূহ অধ্যায়নের পর এই দুর্বল বান্দার নিকট [আল্লাহ

তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন] যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে [আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন] শাসকের পাপাচারসমূহ দু'ধরনের:

এক. যা শাসকের নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের অপরাধ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ করেনা। আর যারা বলেছেন ফাসিক অথবা জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয় তাদের মত এক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হবে।

দুই. যা অন্যের মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করবে। আর তা হলো, কুফরের প্রকাশ স্থলগুলোর অনুমতি প্রদান করা, কুফরের শে'আরগুলো প্রতিষ্ঠা করা, কুফরী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনী বিধি-বিধান সমূহকে গুরত্বহীন মনে করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত থাকা, তাকে অপছন্দ করার কারণে আল্লাহর শরীয়ার উপর অন্য কোনো শরীয়াকে প্রাধান্য দেয়া। আর এ সবগুলোই কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এ ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ হবে।"

[দেখুন: তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহীম, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৬-৩৩১]

উনার দ্বিতীয় পয়েন্টঃ বারজন খলিফা এসে গেছেন। ইমাম মাহাদি (আ) আসার পূর্বে আর কোনো খলিফা আসবে না

ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে, জনাব আবু মুহাম্মাদ আউট অফ কনটেক্সট দালিলা-আদিল্লা দিয়ে মানুষজনকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। কেননা এখানে এটি পরিষ্কার যে, হাদিসে যে বার জনের কথা এসেছে এবং আহলুস সুন্নাহ'র ইমামরা বারজনের ব্যাপারে যা বলছেন তা হচ্ছে, "খিলাফাহ আলা মিনহাজুন নাবুওয়াহ"র ব্যাপারে।(ভুল হলে আলিম ও তালিবুল ইলমদের থেকে সংশোধনী আশা করছি) কিন্তু এই ব্যক্তি বিষয়টি ব্যাপকভাবে নিয়ে হুকুম লাগিয়েছেন।

লক্ষণীয়! কোনো ইমামই বারজন খলিফার আলোচনা শেষে উনার মত এই বলে উপসংহার টানেননি যে,"ইমাম মাহাদি (আ)'র পূর্বে আর কোনো খলিফা আসবে না।"
এছাড়াও উনি যেসকল দালিল দিয়েছেন তার সবই উসমানি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আগে। যদি উনার গবেষণালব্ধ ফলাফল সহিহ তাহলে তো বলতে হয় উসমানি খিলাফতও অবৈধ খিলাফত, যা সুস্পষ্টভাবেই উম্মতের ইজমাবিরোধী।

দেখুন - এই মহোদয়ের অদ্ভুত অবস্থান !! খিলাফত যদি সম্ভব নাও হয়... যদি উনার এই কথাটা মেনেও নেই ... ভালো করে লক্ষ্য করুন - এই ব্যাক্তি খিলাফাহ'র দলীল দিয়ে এটাও প্রমাণ করে দিতে চাইলো যে, ইসলামই হুকুমাতই দিবাস্বপ্ন !! আউজুবিল্লাহ।

এই ব্যাক্তি খানকা-মসজিদের-পীরদের প্রতি বায়াতের ভেতর ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে চাইছে বহু আগে থেকেই। ইচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ইমামদের বক্তব্য এমন স্থানে পেশ করছে যা ইমাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) দের বুঝের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনটা করা সম্পূর্ণই উনাদের উপর অপবাদ আরোপ ব্যাতিত কিছুই নয়। এমন দিমুখীচারিতা থেকে আশ্রয় চাই।

এই ব্যাক্তি আরও কিছু বিষয় এড়িয়ে গিয়েছে, খলিফারা ফাসিক হওয়াতে কি তাদের থেকে বায়াত উঠিয়ে নিতে হবে? খলিফাদের থেকে ইসলাম বিদায় নিয়েছিল বলতে কী বোঝানো হচ্ছে সেটাও তিনি স্পষ্ট করলেন না।

উনি যাদের কাছে বায়াত হতে বলেন তারা কি নিস্পাপ?

উপরন্তু, উনি ইতিমধ্যে ১২ জনের নাম উল্লেখ করে ফেলেছেন। তার মানে দাঁড়ায়, ইমাম মাহাদিও এই ১২ জনের বাইরে !!

আরেকটি বিষয়, অনেক দেওবন্দি ভাই সালাফিদের আক্রমণ করে এই বলে যে, অনেক সালাফি উসমানি খিলাফতের স্বীকৃতি দেয় না। এখানে দেখুন, এই ভদ্রলোক তো মাত্র ১২ জন খলিফা ব্যাতিত বাকীদেরও স্বীকৃতিই দিচ্ছে না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের সামনে থেকে সংশয়ের ফিতনা দূর করে থাকেন!*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৮৯১

কেন আমি আল কায়েদাকে বাছাই করলাম

(Why I Choose Al-Qaeda)

RJ rahi islam

Member

০৭-১৩-২০১৬

সম্মানিত উপস্থিতি,

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, কেন আমরা আল কায়েদাকে বাছাই করলাম পৃথিবীতে অনেক জিহাদি সংগঠন রয়েছে।এছাড়াও পৃথিবীতে অনেক ইসলামিক সংগঠন রয়েছে। এত সংগঠন থেকে কেন আমরা আল কায়েদাকে বাছাই করলাম। তাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে।" **কেন আমরা আল কায়েদাকে বাছাই করলাম** "। আমরা ইচ্ছা করলে অন্য কোন সংগঠনকে বাছাই করতে পারতাম বা অন্য কোন সংগঠন এর মধ্যে অন্তরভুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু কেন আমরা তাঞ্জিম আল কায়েদাকে জিহাদি তাঞ্জিম হিসেবে বাছাই করলাম। এটাই হচ্ছে আজকের আলোচ্য বিষয়। যে কারনে আমরা আল কায়েদায় যোগ দিয়েছি এবং আল কায়েদাকে আমাদের তাঞ্জিম হিসেবে গ্রহন করলাম।

এক নাম্বার কারণঃ কেননা তারা জিহাদের পথকে বাছাই করেছে,জিহাদের এই পথে চলা শুরু করেছে যেহেতু তারা জিহাদের এই পথে চলা শুরু করেছে সেহেতু আমরা তাদেরকে গ্রহন করেছি।আমারা দেখি সমগ্র বিশ্বে আজ মুসলিম উম্মাহ নির্যাতিত ও নীপীড়িত ইরাক,আফগানিস্তান,কাশ্মীর,চেচনিয়া,বসনিয়াস পুরো বিশ্বে যখন মুসলিম উম্মাহকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলিম মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে । প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শানে যখন কটূক্তি করা হচ্ছে, আল্লাহর কুরআনকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর এক একটি সংগঠন এক একটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে । আজকে যারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করছে তারা বলছে, পৃথিবীতে নির্যাতিত মুসলিম উম্মার মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ।আবার আজকে যারা খানকা ইসলামে নফসের

ধারা কাজ করছে তারা বলছে, মুসলিম উম্মাহ এই নির্যাতিত থেকে মুক্তি পাবে নফসের মাধ্যমে ।আবার আজকে যারা দারস ও তাশদীদ এর মাধ্যমে কাজ করছে মাদ্রাসা গুলোতে তারা বলছে,দারস তাশদীদ এর মাধ্যমে যখন একটা আদর্শ সমাজ গঠন করা যাবে তখন মুসলিম উম্মাহ এই নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে। এইভাবে যারা রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করছে তারা বলছে ইসলামিক আন্দোলনগুলো আজকে গনতন্তের আন্ডারে রাজনৈতিকভাবে কাজ করছে তারা বলছে, মুসলিম উম্মাহ এই গনতান্তিক ইসলামিক রাজনৈতিক এর মাধ্যমে নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে। **অতচ আল্লাহ সুবাহানল্লাহ তালা কুরআন পাকে ইরশাদ করেন ,**

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।(সুরা নিসা _৭৫)

আল্লাহ তালা যখন বলছে, তোমাদেরর কি হল তোমরা কেন আল্লার রাস্তায়ে লড়াই করছ না ঠিক এই মুহূর্তে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাঞ্জিম আল কায়েদা। তারা আল্লাহ সুবাহানল্লাহ তালার এই ডাকে সাড়া দিয়ে মজলুম উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য জিহাদের পথে নেমেছে এই জন্যই তারা জিহাদের পথকে গ্রহন করেছে। আর আজকে যারা বলছে বিভিন্ন উপায়ে দ্বীন কায়েম হবে। অথচ আল্লাহতালা তার কালামে পরিষ্কারভাবে বলছে " **তাদের বিরুধ্যে লড়াই করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে কায়েম হয়"** । তো দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে কায়েম হবে কিসের মাধ্যমে? কিতালের মাধ্যমে,জিহাদের মাধ্যমে। আল্লাহ তালা বলছেন,তোমরা তাদের বিরুধ্যে লড়াই কর। (সুরা আনফালের ৩৯নং)আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলেছেন,কিতালেই হচ্ছে একমাত্র দ্বীন কায়েমের পথ। এভাবেই এই উম্মাহ যে

কঠিন পরিস্তিতে রয়েছে এই কঠিন পরিস্তিতি থেকে রক্ষা পাওার জন্য রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন, " যখন তোমরা ইনা জাতীয় ও সুধি ব্যাবসা সাথে জড়িত হবে এবং তোমরা গরুর লেজ ধরবে তোমরা তোমাদের চাষাবাদ ফসল এগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবা ফলে জিহাদকে ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তালা তোমাদের উপর জুলুম ও লাঞ্ছনাকে চাপিয়ে দিবে। আর এই লাঞ্ছনা অপদস্ততা তোমাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসো" । (আবু দাউদ)

মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন,যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জিহাদ ও কিতালের দিকে ফিরে না আসো এবং জিহাদকে আকড়ে না ধরো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে উপর জুলুম,লাঞ্ছনা অপদস্ততা উঠিয়ে নেওয়া হবে না। আবু দাউদ এই হাদিসের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যখন মুসলিম উম্মাহ জিহাদকে ছেড়ে দিবে তখন তাদের উপর লাঞ্ছনাকে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এই লাঞ্ছনা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে না যতক্ষণ না তারা জিহাদের দিকে ফিরে না আসে। তাহলে রাসুলের এই কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই উম্মাহর মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে, এই উম্মাহ যদি জুলুম,নির্যাতন,নিপীড়ন এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জিহাদ_ফি_সাবিলিল্লাহ । এই জন্যই আমরা দেখতে পাই তাঞ্জিম আল কায়েদা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বাণী গুলোকে সরণ করেই জিহাদের পথে চলেছে। আমরা এই তাঞ্জিমে যোগ দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, কেননা তারা এই জিহাদের পথকে গ্রহন করেছে এবং জিহাদের পথে চলছে। এ ছাড়াও কুরআনে প্রায় পাঁচশো আয়াতে এ শুদু মাত্র জিহাদের কথা রয়েছে। এভাবেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস রয়েছে যেগুলো জিহাদ সংক্রান্ত । কিতাবুল মাগাজি, কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়ে গুলোতে মুহাদ্দিসীনে কিরাম জিহাদ সংক্রান্ত হাদিস গুলোকে উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস গুলো অন্য যত সংগঠন রয়েছে পৃথিবীতে কেউ এর উপর আমল করছে না। শুধুমাত্র তাঞ্জিম আল কায়েদা এই হাদিস গুলোর উপর পুরনাঙ্গ আমল করছে । যেহেতু তারা জিহাদের পথে চলছে এই জন্যই আমরা তাদের মাঝে অন্তরভুক্ত হয়েছি।তার জন্যই আমরা তাঞ্জিম আল কায়েদাকে আমাদের তাঞ্জিম হিসেবে বেছে নিয়েছি ।

দুই নাম্বার কারণঃ আমরা আল কায়েদাকে নিজেদের দল হিসেবে বাছাই করলাম, এরাই হচ্ছে আত তায়েফাতুল মানসূরা। **রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের একটা দল সব সময় হকের উপর সাহায্য পাপ্ত থাকবে,কেউ যদি তাদেরকে অবহেলা করে অথবা বিরোধিতা করে কিন্তু কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেয়ামত পর্যন্ত কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।** তাই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদিসের মধ্যে বলেছেন, হকের উপর একটা দল সাহায্য পাপ্ত থাকবে। তাই তায়েফাতুল মানসূরার বৈশিষ্ট্য গুলো অন্য হাদিসে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। তায়েফাতুল মানসূরার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তারা হকের উপর থেকে লড়াই করবে। " **রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন আমার উম্মতের একটা দল সব সময় হকের উপর থেকে লড়াই করবে এবং তারা কেয়ামত পর্যন্ত বিজয় থাকবে"। (সহি মুসলিম)।** এভাবে আরেকটা হাদিসে আসছে ," **রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন আমার উম্মতের একটা দল সব সময় হকের উপর লড়াই করতে থাকবে এবং তাদের বিরোধীদের উপর সব সময় বিজয়ী থাকবে । তাদের শেষ দল মাসিয়া দাজ্জাল এর সাথে লড়াই করবে " (মুস্তাদার হাকেম)।**

এই যে মুজাহিদের দলটা থাকবে তারা অবশেষে দাজ্জাল বিরুধ্যে লড়াই করবে। এই হাদিস গুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, আত তায়েফাতুল মানসূরার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তারা হকের উপর থেকে আল্লাহর রাহে লড়াই করবে এবং শেষ দল হিসেবে দাজ্জাল মাসিয়ার সাথে লড়াই করবে। ঠিক তেমন আল কায়েদার মুজাহিদরা হকের উপর থেকে লড়াই করছে। **সুতারাং এরাই হচ্ছে এই জামানার আত_ তয়েফাতুল মানসুরা ।** তাদের মাধ্যমে আজ এই কিতালটা ধারাবাহিক আছে। আজকে যে আছে সেটার প্রমাণ শুদু এই তাঞ্জিমের মাধ্যমেই আছে। সুতারাং **এরাই হচ্ছে আত তয়েফাতুল মানসুরা**। সুতারাং এটা হচ্ছে সেকেন্ড কারণ তাঞ্জিম আল কায়েদাকে আমাদের তাঞ্জিম হিসেবে বাছাই করা।

তিন নাম্বার কারণঃ তারা হচ্ছে গুরাবা ।তারা হচ্ছে অপরচিত গুরাবা। **রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ইসলাম শুরু হয়েছে অপরচিত বা গুরাবা অবস্তায়ে। এটা যেভাবে অপরচিত অবস্তায়ে শুরু হয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই**

অচিরেই অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শেষ হয়ে যাবে। আবারো এটা গরিব হয়ে যাবে যেভাবে এটার সূচনা হয়েছিল সুতরাং সু সংবাদ হচ্ছে গুরাবাদের জন্য। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)জিজ্ঞাসা করা হল গুরাবা কারা," রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন মানুষেরা যখন খারাব হয়ে যাবে তখন মানুষদেরকে ইসলা/সংস্কার যারা করবে তারাই হচ্ছে গুরাবা"। আজকে আমরা দেখি, যখন গনতন্ত, সমাজতন্ত,কম্যুনিজম এই সব বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যখন মানুষ হারিয়ে গেছে। মানুষ যখন নষ্ট গনতন্ত বাস্তবায়ন করতে ব্যস্ত তখন এই সংস্কার এর কাজ হাতে নিয়েছে তাঞ্জিম আল কায়েদা। ঠিক সেই সময় এই নষ্ট সমাজকে সংস্কার এর কাজ হাতে নিয়েছে তাঞ্জিম আল কায়েদা এবং তারা সারা বিশ্বে ইসলামিক শারিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ হাতে নিয়েছে। এরাই হচ্ছে যখন মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে তখন এদেরকে সংস্কার করার কাজ করে যাচ্ছে তাঞ্জিম আল কায়েদা। এভাবেই আরেকটা হাদিস হল রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,"সুসংবাদ হচ্ছে গুরাবাদের জন্য,রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞাস করা হল গুরাবা কারা? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, গুরাবা হল বিভিন্ন গোত্র থেকে আসা কিছু লোকের সমষ্টি" আজকে আমরা আফগানিস্তানে দেখি তাহলে সেখানে আরব ,ইউরোপ,যুক্তরাষ্ট আরও বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করছে। এই সব মুজাহিদ ভাইরা এক একট গোত্র থেকে জিহাদের ময়দানে শামিল হয়েছে । আজকে যদি আমরা সোমালিয়ার দিকে তাকাই তাহলে সেখানেও বিভিন্ন দেশ থেকে মুজাহিদ ভাইরা এসে এক্রতিত হয়ে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে আর হিজরত করার বৈশিষ্ট্য (গুন) হচ্ছে এই যুগের গুরাবা। এভাবেই সিরিয়াতে জাবাতাল নুসরা ভাইরা বিভিন্ন দেশ থেকে হিজরত করে এখানে আসছে সুতরাং এরাই হচ্ছে বিভিন্ন গোত্র থেকে আসা কিছু লোক। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, " সুসংবাদ হচ্ছে গুরাবাদের জন্য। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল গুরাবা কারা তিনি বলেন, অনেক মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভাল লোক অর্থাৎ তাদের অনুসারীদের চাইতে তাদের বীরুধী লোক হবে বেশি " । সুতারাং আজকে আমরা দেখছি তাঞ্জিম আল

কায়েদার তাদের অনুসারীদের চাইতে তাদের বীরুধী অনেক বেশি এই যে তাদের বিরোধিতা হচ্ছে সুতারাং এগুলোই তাদের তাদের গুরাবা হওয়ার বৈশিষ্ট্য। তাই এই যুগের গুরাবা হচ্ছে তাঞ্জিম আল কায়েদা। এই যে তারা গুরাবা তাই আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি । এই জন্যই আমরা তাদের অনুসরণ করা শুরু করেছি কারণ তারাই হচ্ছে হকের উপর ।

চার নাম্বার কারণঃ চার নাম্বার কারণ হচ্ছে কেননা তারা মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসরণ শুরু করেছে। এই জন্য আমরা আমাদের দল হিসেবে তাঞ্জিম আল কায়েদাকে বাছাই করেছি । আল্লাহ সুবাহানল্লাহ তালা কুরআনে অনেক জাইগায়ে মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসরণ করতে বলা বলছে। **আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন, " অতঃপর আপনার নিকট ওহি করলাম আপনি একনিসটভাবে মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসরণ করুন ইব্রাহিম কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা"। (সুরা নাহল ১২৩) । আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে বলেন" তোমরা একনিষটভাবে মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসরণ করুন।ইব্রাহিম কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।(সুরা ইব্রাহিম ৯০)। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন শুদুমাত্র বোকারাই মিল্লাতে ইব্রাহিম থেকে বিমুখ থাকে" (সুরা বাকারহ ১২৯)** যারা মিল্লাতের ইব্রাহিম থেকে বিমুখ থাকে এবং তাদের অনুসরণ করে না **আল্লাহ তাদের কে বলছেন নির্বোধ ।** যাদের কোন বুদ্ধি,জ্ঞান,বিবেক নাই এরাই মিল্লাত থেকে বিমুখ থাকে। আল্লাহ তালা মিল্লাত এর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে আর মিল্লাতে ইব্রাহিমটা কি? মিল্লাতে ইব্রাহিমটা হল, কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এটাই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহিম । **আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন,"তোমাদের জন্য ইব্রাহিম (আঃ) এর জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ এবং তাদের সাথে যারা ছিল তাদেরও রয়েছে উত্তম আদর্শ তোমাদের জন্য"(সুরা মুমতাহিনা ৪)**। উত্তম আদর্শটা কি ? যখন তারা তাদের জাতীকে বলেছিল, আমরা তোমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, আল্লাহকে বাধ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের থেকে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করলাম আমরা তোমাদের মানি না আমাদের ও তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা । যতক্ষণ না তোমার এক আল্লাহর পতি ইমান আনবে। তাই ইব্রাহিম (আঃ)যেভাবে তার জাতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল ঠিক সেই ভাবেই তাঞ্জিম আল কায়েদা ইসলামের শত্রুদের থেকে সম্পর্কও ছিন্ন করেছে তার এই মিল্লাতেরই অনুসরণ

করছে। তারা এই জাতিকে বলেছে, আমরা তোদের মানি না, তোদের এই কুফরি বিধান থেকেও আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তোদের মাঝে ও আমাদের মাঝে শুরু হল চির শত্রুতা। যতক্ষণ না তোরা এক আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসছ। এই ক্ষেতরে তাঞ্জিম আল কায়েদা তাহ পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছে। এই জন্যই আমরা তাঞ্জিম আল কায়েদাকে আমাদের তাঞ্জিম হিসেবে বাছাই করলাম । কেননা তারা মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছে। আর এটাই হচ্ছে চার নাম্বার কারণ।

পাঁচ নাম্বার কারণঃ কেননা তাদের মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বার এর আকিদা রয়েছে। আল্লাহর ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা করা। এই আকিদাটাই তাদের মধ্যে রয়েছে । যেমন আমরা দেখতে পাই আল ওয়ালা তারা কিভাবে মুমিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা মুমিনদের জন্য নিজেদের জান উঝার করে দিচ্ছে। সেই কায়েদাতুল জিহাদের যিনি আমির ছিল তিনি উছামা বিন লাদেন (রঃ) তিনি সুদূর আরব থেকে সব কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছেন আফগানিস্তানে মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য এবং তিনি জিহাদের ভূমিতে তার জীবন অতিবাহিত করেছেন। সুতারাং এটাই ছিল ওয়ালা মুমিনদের জন্য ভালবাসা । আজকে যে ফিলিস্তিনে গণহারে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চলছে এর জন্য তাঞ্জিম আল কায়েদাতুল জিহাদের আমীর উছামা (রহঃ) তিনি ফিলিস্তিনি ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,নিশ্চয় তোমাদের রক্তই হল আমাদের রক্ত, নিশ্চয় তোমাদের সন্তানের রক্তই আমাদের সন্তানের রক্ত সুতারাং যেনে রাখো; রক্তের বদলে রক্ত, ধ্বংসের বদলে ধ্বংস আর যেনে রাখো আমরা তোমাদের ব্যাপারে কোন অবহেলা করবো না। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আব্দুল মুত্তালিব মত শাহাদা বরণ করতে পারি যেই শাহাদাত বরণ করে ছিল আব্দুল মুত্তালিব।যেহেতু তিনি এই কথা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী তিনি তার কথা বাস্তবায়ন করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দেখেছি তিনি শাহাদাহ বরণ করার আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিনি ভাইদের জন্য কাজ করে গেছেন । যেই সকল ভাই আফগানিস্তানে অবস্তান করতেছেন তারাও বলে যদিও আমরা আফগানিস্তানে অবস্তান করতেছি কিন্ত আমাদের চোখ গুলো ফিলিস্তিনি

ভাইদের দিকে। ইনশাল্লাহ আমরা বাইতুল মোকাদাসকে মুক্ত করে ছাড়ব। তাহছারা যেই সকল ভাইরা সিরিয়াতে অবস্তান করতেছেন তারও কিছুদিন আগে গোলান মালভূমি পর্যন্ত পোঁছে গেছেন এবং যেখানে ইসরাইলি বর্ডার সেখানেও তারা পোঁছে গেছেন । তাদের নিয়ত আছে ইনশাল্লাহ তারা বাইতুল মোকাদাসকে আবারো বিজয় করবে ।এভাবে ইয়েমেনের যেই ভাইরা যুদ্ধ করতেছেন জাযিরাতুল আরবে তারাও বলে থাকেন,"হে আকসা আমরা আসতেছি" এভাবেই ভ্রাতৃত্ববোধ যে বিষয়টা তা শাইখদের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে আমাদের। শাইখ উছামা বিন লাদেন (রহঃ)আরেকটা কথা ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে ছিল। মুমিনদের পতি এই ভালবাসা থেকেই তো যুদ্ধ শুরু করেছেন। তাঞ্জিম আলা কায়েদার যে মূল কাজ হল, যারা নির্যাতিত মজলুম তাদেরকে সাহায্য করা এভাবেই আমার দেখতে পাই আল কয়েদাতুল জিহাদ নতুন যে শাখা ঘোষণা করা হয়েছে আইমান আল জাওাহিরি এর নতুন নাম দিয়েছেন আল কয়েদাতুল জিহাদ। **"হিন্দুস্তানের কয়েদাতুল জিহাদ" শাইখ আইমান আল জাওাহিরি যেই নতুন নাম ঘোষণা দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন তাঞ্জিম আল কায়েদার ভাইরা উপমহাদেশের হিন্দুস্তানের ভাইদের কে ভুলে জান নাই।** তারা ভুলে যায় নাই বাংলাদেশের ৫ই মে সেই শাপলা চত্বরের গণহত্যা । তারা ভুলে জায় নাই আহমেদাবাদ ও আসাম ও মায়ানন্মারের সেই বর্বর গণহত্যা তারা ভুলে যায় নাই কোন ঘটনা এই জন্যই তা রা এই মজলুম মুসলিমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে । তারা উপমহাদেশে ইসলামিক খিলাফাহ কায়েম করার জন্য তাঞ্জিম আল কায়েদা নাম ঘোষণা করেছে" হিন্দুস্তানের কায়েদাতুল জিহাদ" । আলহামদুলিল্লাহ ,তারা মজলুমদেরকে হেল্প করার জন্য ,মুসলিমদের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ ইস্তাপন করার জন্যই এই কাজ করছেন। দুনিয়াবি বা অন্য কোন কারণে না শুদুমাত্র এই উপমহাদেশে মজলুম মুসলিমদেরকে হেল্প করার জন্যই উপমহাদেশে আগমন তাঞ্জিম আল কায়েদার। তাদের মাঝে এই অনুভূতি রয়েছে সমস্ত মুসলমানরা হচ্ছে একটা দেহ যদি দেহের কোন অংশ ব্যথা অনুভূতি হয় তাহলে দেহের পুরো অংশই ব্যথা অনুভব হয়। আসলে আল ওয়ালা যে আল্লাহর জন্যই ভালবাসা সেটা তাদের রয়েছে। এই জন্যই তারা মুমিনরা হচ্ছে ভাই ভাই

এবং সকল মুসলমানেকে এক করতে পেরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আল কায়েদা পতিটি বিশ্বে তাদের শাখা ঘোষণা করেছেন এবং তারা চাচ্ছে সেখান থেকে বিশ্বব্যাপী একটা জিহাদ এবং বিশ্বব্যাপী একটা খিলাফাহ । এই উম্মত হবে একটা তাদের খিলাফাও হবে একটা এবং তাদের খলিফা ও হবে একজন। তাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা সৃষ্টি করার গুণাবলি রয়েছ। আজকে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বে কাফেরদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। কারণ **আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, " হে ইমানদারগণ তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করিও না তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু নিরছয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে কখনো হেদায়াত দেন না।(সুরা মায়েদা৪১)।** এই জন্যই আল্লাহ সুবাহানল্লাহ তালার ডাকে সাড়া দিয়ে সারা বিশ্বের কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সুতারাং তাদের মাঝে যেহেতু আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ আকিদাহ রয়েছে তাই আমরা তাদেরকে আমাদের তাঞ্জিম আল কায়েদাকে হিসেবে গ্রহন করেছি অন্য কোন তাঞ্জিমকে আমাদের তাঞ্জিম হিসেবে গ্রহন করি নাই।

ছয় নাম্বার কারণঃ যেই কারণে আমরা তাঞ্জিম আলা কায়েদাকে আমদের দল হিসেবে বাছাই করেছি । কারণ তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আল্লাহর শত্রুকে ভীত সংহত করে রাখতেছে এই জন্যই আমরা নিজেদের দল হিসেবে বাছাই করেছি । **আল্লাহতালা ইরশাদ করেন তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন কর,প্রস্তুতি গ্রহন কর এবং তোমাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করে রাখো এর মাধ্যমে তোমরা আল্লহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে ভীত সংহত করে রাখতে পারবে।(সূরা আনফাল ৬০)** ।যেহেতু জিহাদ আমাদের উপর একটা ফরয দায়িত্ব সেহেতু জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ফরয কারণ একটা উসুল রয়েছে যে জিনিসটার কারণে একটা ওয়াজিব পালন করা যাচ্ছে না সেটা পালন করা একটা ওয়াজিব ।সুতারাং ইদাদটা ও একটা জিহাদের অংশ । **আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন " যদি তারা জিহাদের যেত তাহলে জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিত " (সূরা মায়েদা ৪৬)** ।আমরা দেখি কায়েদাতুল জিহাদ আল কায়েদা আল্লাহর শত্রু ও মুসলমানের শত্রুকে ভীত সংহত করে রাখে। তারা বিভিন্ন সময় আমেরিকান এর

উপর আক্রমণ চালায় যাতে তারা ভীত সংহত হয় থাকে। ৯/১১ কেন হয়েছে শুদু মাত্র আল্লাহর শত্রু ও আমাদের শত্রুকে ভীত সংহত করে রাখার জন্য মূলত এর জন্যই হয়েছিল ৯/১১। তাঞ্জিম আল কায়েদাতুল জিহাদের একজন শাইখ একটা কলামে বলেছিলেন ভীত সংহত করাই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এবং যে অস্বীকার করল সে কুফরি করল। কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা এটাও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত কারণ **আল্লাহ তালা বলেন " আমার আয়াত গুলোকে শুদু মাত্র কাফেরাই অস্বীকার করে। " (সূরা আনকাবুত ৪৭)** সুতারাং যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করল সে কুফরি করলো আর কাফেরাই শুদু আয়াত আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে থাকে। কেননা তারা আল্লাহর শত্রুকে ভীত সংহত করে রাখছেন না। এই কারণ গুলোর কারণেই আমরা আল কায়েদাতুল জিহাদ আল কায়েদাকে আমাদের দল হিসেবে বাছাই করেছি।

সাত নাম্বার কারণঃ যেই কারণে আমরা তাঞ্জিম আল কায়েদাকে আমাদের দল হিসেবে বাছাই করেছি। কেননা তারা সঠিক মুহাক্কিক আলেমদের দেখানো পথ অনুযায়ী তাদের জিহাদী কার্যক্রম চালায়। এই জন্যই আমরা আমাদের দল হিসেবে তাদেরকে গ্রহন করেছি। আমারা দেখতে পাই তাঞ্জিম আল কায়েদাতুল জিহাদের মধ্যে যত শাইখ উলামা ছিল যেমন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) যিনি আল কায়েদা জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর ইল্মের মাকাম অনেক উঁচু তাঁর চার মাযাবের উপর ডিগ্রি ছিল এছারও তিনি ইল্মে ছিলেন অনেক পারদর্শী। আরব অনারব সব জায়গায় তাঁর কথা ছিল সমাদিত।এই যে মহান একজন শাইখ তিনি জিহাদের ময়দানে চলে এসেছেন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আফগান জিহাদ হয়েছে। সুতারাং এই থেকে বোঝা যায় তারা মুহাক্কিক আলেমদের কিভাবে তাদের পথ অনুসরণ করে। তাহছারা শাইখ আব্দুলাল্লাহ আযম (রহঃ) তাঁর শাহাদাহ এর পর অনেক বড় বড় উলামা ছিলেন যেমন শাইখ ইয়া ইয়া আল লিব্বি তিনি একজন বিচক্ষণ আলেম ছিলেন , শাইখ আতিউল্লাহ (রহঃ)আলেম ছিলেন এরূপভাবে শাইখ আইমান আল আউলাকি (রহঃ) যাকে আরব অনারব সবাই চিনে। তিনিও ছিলেন বিচক্ষণ একজন আলেম। আনওয়ার আল আউলাকি(রহঃ) যিনি ইয়েমেনের আল কায়েদার দায়িত্বে ছিলেন। শাইখ

আব্দুল্লাহ আযম (রহঃ) যখন কোন ফতওয়া দিতেন তখন চারটি মাজহাবের আলোকে দিতেন; ফিকে হানাফি, ফিকে শাফি,ফিকে হাম্বলি এবং ফিকে মালিকি এই চারটি মাজহাবের আঙ্গিকে তিনি ফতওয়া দিতেন । তাঁর ফিকাহ " মুসলিম ভূমি পতি রক্ষা " সর্ব জায়গায় সমাদিত হয়েছে। তিনি কাফেরদেকে পতিহত করার জন্য একটা ফতওয়া দিয়েছেন "মুসলিম ভূমি পতি রক্ষা" এই ফতওয়াটা দেখে **মক্কার শাইখ বিন বায বলেছিলেন এত সুন্দর ফতওয়া তুমি লিখছ**। এই জন্যই তাঞ্জিম্ম আল কায়েদা সব সময় বড় বড় আলেমদের দেখানো পথে চলে এভাবে সিরিয়াতে শারিয়া বিভাগের দায়িত্বে যিনি আছেন শেখ সামি আল ওয়ারাইদি তিনি সিরিয়ার একজন বড় উঁচু মানের আলেম সেখানে আরও দায়িত্বে রয়েছেন সুলাইমান আল মুহাজির তিনি আলহামদুলিল্লাহ তাঁর আলোচনা শুনলে বোঝতে পারবেন তিনি কত বড় একজন আলেম। এভাবে বর্তমানে ইয়েমানে শারিয়া বোর্ডের শাইখ ইব্রাহিম আল মুবাইশ তিনি একজন বিচক্ষন আলেম । এভাবে খুরাসানের একজন আলেম মাওলানা আসেম উমর (হাঃ) উনার ইল্মি মাকাম অনেক আমরা উনার কিতাব পড়লেই বোঝতে পারবো উনার ব্যাপারে উনার লিখা " দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধও দাজ্জাল" , " ইমাম মাহাদির দোস্ত ও দুশমন" " দুটি জীবন আদর্শের যুদ্ধ" তাহছার তাঁর আরো অনেক কিতাব আছে যা থেকে তাঁর ইল্মি মাকাম জানা যায় এবং তিনি পাকিস্তানের মধ্যে একজন বিখ্যাত আলেম এছাড়া বর্তমানে উপমহাদেশের(ভারত,বাংলাদেশ,মায়ানমার)আলেম। যুগে যুগে যারা আল কায়েদার মধ্যে ইল্ম দিয়ে সাহায্য করেছেন তারা সবাই ছিলেন বিচক্ষণ। তাঞ্জিম আল কায়েদা সব সময় আলেমদের দেখানো পথ ধারাই চলে থাকে। যেহেতু তারা মুহাক্কিক আলেমদের কথা অনুযায়ী চলে তাই আমরা আমাদের দল হিসেব তাঞ্জিম কায়েদাকে আমাদের দল হিসেব বাছাই করলাম।

আট নাম্বার কারণ: যুদ্ধ বিগড়ত অঞ্চলগুলোতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যৎবাণী হাদিস অনুযায়ী সেগুলো তাদের সাথে মিলে যায়। তারাই হচ্ছে বর্তমানের হক দল ।এর জন্যই আমরা তাদেরকে আমাদের দল হিসেব তাদেরকে গ্রহন করলাম। যেমন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

)১৪০০ বছর আগে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল তাহ মূলত আমাদের জন্য। আমরা যে যুগে অবস্তান করছি এই যুগেই সেই ভবিষ্যৎবাণী গুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন" অচিরেই তোমাদের মাঝে অনেক গুলো বাহিনী বের হবে, একটা বের হবে শাম; এটা সিরিয়া, জর্ডান,ইরাক ও ইয়ামান এবং ফিলিস্তিনির কিছু অংশ মিলেই হল শাম। আর শামের প্রাণ কেন্দ হচ্ছে সিরিয়া। থেকে " (মুসনাদে আহমেদ)। আমরা যদি আজকে বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এর ভবিষ্যৎবাণী গুলো আমাদের যুগে বাস্তবায়ন হচ্ছে। যেমন শাম থেকে একটা বাহিনী বের হবে আজকের শাম হচ্ছে সিরিয়া যদি সিরিয়ার দিকে তাকাই তাহলে সেখানে জাবাতুল নুসরা সকল দল গুলো নিয়ে কাজ করার সম্বরণয় করতে চাচ্ছে। আর জাবাতুল নুসরা হল আল কায়েদার একটা শাখা ।আর এই যে ভবিষ্যৎবাণীগুলো বাস্তবায়ান হচ্ছে সেগুলো আল কায়েদার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ইরাক থেকেও একটা বাহিনী বের হবে আজকে যারা ইরাকে জিহাদ করছে তারাও আল কায়েদার একটা সংগঠন যার প্রধান ছিলেন আবু মুসা আল যারকাবি (রাহঃ)। যখন ইরাকে আল কায়েদা প্রতিষ্ঠাতাহয় তখন এর প্রধান ছিলেন তিনি। তারপর আসে আবু হামজা আল মুহাজিরি এরপর আসে আবু বকর আল বাগদাদি যারা জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ঠিক তেমনি ভাবে ইয়ামান থেকে একটি বাহিনী বের হবে বর্তমানে যেই দলটা জিহাদ করে যাচ্ছে ইয়ামানে তারাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা তারাও আল কায়েদার একটি অঙ্গসংগঠন । তাদেরকে বলা হয় AQAP " আল কায়েদা ইন এরাবিক পেনিনসুলা" ।এটা বর্তমানে ইয়ামান থেকে পরিচালিত হয়। ইবনে হাওয়ালা নামে একজন সাহাবা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাস করলেন," হে আল্লাহর রাসুল যখন তিনটা বাহিনী বের হবে তখন আমি কোনটাতে যোগ দিব তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন , আমি তোমাদেরকে বলব শামের সিরিয়া বাহিনীতে যোগ দেও । কেউ যদি শামের বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে সে যেন ইয়ামান বাহিনীতে যোগ দেয় "। এইযে তিনটা বাহিনী বের হওয়ার কথা এই বাহিনীগুলো আল কায়েদার নেতৃত্বে রয়েছে। সুতারাং বোঝা যাচ্ছে ১৪০০ বছর আগে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হাদিস গুলো উল্লেখ করেছেন তাহ আল কায়েদার

মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হয়েছে। ইয়ামান থেকে যেই বাহিনীটা বের হবে তাহ কোন অঞ্চল থেকে বের হবে তাহ অন্য একটা হাদিসে উল্লেখ পাওয়া যায়। **রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ১২ হাজারের একটা কাফেলা বের হবে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাহায্য করবে আমার মাঝে এবং তাদের মাঝে তারাই হবে সেরা (মুসনাদে আহমেদ)** । আজকে যে আরব পেনিনসুলা সেই শাখাটা আরব উপদ্বীপে তাহ মূলত পরিচালনা হচ্ছে ইয়েমান থেকে। ইয়েমান আরব আদিল জায়গা থেকে যেটা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এভাবেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ১৪০০ বছর আগের কথা বাস্তবায়ন হচ্ছে এখন তাঞ্জিম আল কায়েদার এর মাধ্যমে। এভাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সকল হাদিস প্রমাণিত হচ্ছে তাঞ্জিম আল কায়েদাতুল জিহাদ আল কায়েদার মাধ্যমে। আর কিছু হাদিস **আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন খুরাসান এর ব্যাপারে " খুরাসান থেকে কালো পতাকা বাহী একটা দল আত্মপ্রকাশ করবে কেউ তাদেরকে পতিহত করতে পারবে না" ।(মুসনাদে আহমেদ)**। আমরা দেখি খুরাসান থেকে যে দলটা আত্মপ্রকাশ করেছিল তাহ মোল্লা মুহাম্মাদ এর নেতৃত্বে তালেবান ও শাইখ উসামার নেতৃত্বে আল কায়েদা। তারাইতো খুরাসান থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বের সকল শক্তি এক করেও পারে নাই তাদের মনোবল ভাঙ্গতে ঠিক তাই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন কেউ তাদের পতিহত করতে পারবে না। ঠিক আমাদের এই হিন্দুস্তানের জন্য একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন দুইটা দল যাদেরকে আল্লাহতালা জাহানামের আগুণ থেকে মুক্তির গ্যারান্টি দিচ্ছে একটা দল যারা হিন্দুস্তানে লড়াই করবে আরেকটা দল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)এর সাথে থেকে দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। আসলে সাড়া বিশ্বে কাজ সেই মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত কাজ হচ্ছে। সোমালিয়াতে কাজ করছে আসা সাহাব আল কায়েদার আন্ডারে মালীতে কাজ করছে আনসার আদ দ্বীন, সিরিয়াতে কাজ করে যাচ্ছে জাবাতুন নুসরা, ইয়ামেনে আনসার আল শারিয়া, পাকিস্তানে তেহেরিক ই তালেবান। হিন্দুস্তানে কোন কাজ করা হচ্ছে না তাই বর্তমানে আল কায়েদার আমীর আইমান আল জাওাহিরি (হাঃ) তিনি

উপমহাদেশে কাজ করার জন্য একটি দল গোষনা করেন "কায়েদাতুল জিহাদ হিন্দুস্তান"। এটি আল কায়েদার অন্য একটি উপমহাদেশীয় শাখা। আল্লাহ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসের বাস্তবায়ন যে গাযওয়ে হিন্দ বাস্তবায়ন করা এই বিষয়টা খেয়াল রেখে তিনি হিন্দুস্তানে জিহাদের উদ্দেশ্য ডাক দিলেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস অনুযায়ী হিন্দুস্তানে যে বাহিনী জিহাদ করবে তার জন্যই তিনি সেই বাহিনীটা তৈরির জন্য হিন্দুস্তানে আল কায়েদাতুল জিহাদ ডাকের মাধ্যমে তা আত্মপ্রকাশ হয়ছে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত এই সব অঞ্চলের মুজাহিদেরকে এক করে জালিমের জুলুম থেকে মুসলিমকে মুক্ত করে এই উপমহাদেশে ইসলামিক শারিয়া বাস্তবায়ন করা । তাই আল কায়েদা চাচ্ছে তাদের মাধ্যমেই যেন হিন্দুস্তানে কালো পতাকাবাহী দল আত্মপ্রকাশ করে। আমরাই হব গাযওয়াতুল হিন্দের "মুকাদামতুল জেইস" কারণ এই গাযওয়াতুল হিন্দ এমন একটা যুদ্ধ যেই যুদ্ধের জন্য সাহাবাকারামগণ ও এই যুদ্ধ করার কথা প্রকাশ করেছেন **আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন আমি যদি ওই সময় থাকি আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে ওই যুরধে যোগ দিবো এতে যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি হব** সর্বশ্রেষ্ঠ **শহীদ আর আমি আবু হুরাইরা যদি ওই যুদ্ধ থেকে গাজী হয়ে ফিরতে পারি তাহলে আমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তটির গ্যারান্টি নিলাম।** আবু হুরাইরার মত সাহাবি এই গাওয়াতে যুদ্ধ করার জন্য প্রকাশ করেছেন কিন্তু আমরা হিন্দুস্তানে বসে বসে আছি আমরা কি পারি না এই হিন্দুস্তানে মুজাহিনদের সাথে এক হয়ে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিসকে বাস্তবায়ন করতে। আলহামদুলিল্লাহ এই জন্যই তাঞ্জিম আল কায়েদা হিন্দুস্তানে দল ঘোষণা করেছেন যাতে এমনটা না হয় কাফেলা আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে ।কিন্তু আমরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারলাম না। সতর্ক থাকা উচিত যাতে কাফেলা আমাদের থেকে ছুটে না যায়।আমরা সকলেই যেন গাযওয়া হিন্দে বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করতে পারি এর জন্য আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন।

নয় নাম্বার কারণঃ যেই কারণে আমরা আল কায়েদাকে আমাদের দল হিসেবে বাছাই করেছি।কেননা তারা মুস্তাহাবের পূর্বে ওয়াজিব এর উপর আমল করতে

শুরু করেছে এবং মুস্তাহাবের উপর ওয়াজিবকে প্রাধান্য দিয়েছে। আজকে যখন সারা বিশ্বে মুস্তাহাব এবং নফল বিষয় নিয়ে মারামারি করছে তখন তাদের ফরয এর ব্যাপারে কোন খবরই নেই জিহাদ যে একটা ফরয ইবাদাত তা তারা ভুলেই গেছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন," ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি ;কালিমা,সালাত,সাওম,যাকাত ও হজ্ব এই পাঁচটি হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি আর এগুলোর ছাদ হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ।একটি উদাহরণ এর মাধ্যমে তাহ বোঝানো যাক মনে করুন একটি বিল্ডিং দাড় করার জন্য কিছু পিলার দরকার এই পিলার গুলো হল নামায,রোজা,হজ্ব, যাকাত আর এগুলোর ছাদ হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিহিলিল্লাহ। তাই ইসলামের ছাদ হচ্ছে জিহাদ ছাদ ছাড়া যেমন বিল্ডিং হয় না ঠিক তেমনি জিহাদ ছাড়া ইসলাম টিকে থাকবেনা।তাই আল কায়েদা বিল্ডিং এর ছাদ নির্মাণ করার চেষ্টা করছে। যদি বিল্ডিং এর ছাদ না থাকে তাহলে বাইরের সব ময়লা ভিতরে এসে পরবে। তাই বুঝতে পারলাম আল কায়েদা ইসলামের সব চেয়ে উঁচু মাকাম এর জন্য চেষ্টা করছে।

দশ নাম্বার কারণঃ আমরা যেই কারনে আল কায়েদাকে গ্রহন করলাম তার মধ্যে অন্যতম হল এই তাঞ্জিম উম্মাহর বীরদেরকে স্মরণকরিয়ে দেয়। যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদ(রাঃ)উম্মাহর বীর,সালাউদ্দিন আইয়ুবি, তারেক বিন জিহাদ,মুহাম্মাদ বিন কাশিম এরাই হল উম্মার বড় বড় বীর। আজকে যেই সংঘটনেরই হোক তারা কি খালিদ বিন ওয়ালিদের কাজ করতেছে?তারা কি সালা উদ্দিন আইয়ুবি এর কাজ করতেছে? তারা কি তারেক বিন জিহাদের কাজ করতেছে ? তারা কি মুহাম্মাদ বিন কাশিম এর কাজ করতেছে? কখন না কারণ রাস্তায়ে মিসিল করা দেওয়ালে ব্যানার ফেস্টুন ছবি লাগানো এগুলো কি খালিদ বিন ওয়ালিদের কাজ ?খালিদ বিন ওয়ালিদের কাজতো ছিল খোলা তরবারি নিয়ে জালিমের বিরুধ্যে ঝাঁপিয়ে পরা এবং কাফিরদের শিরছেদ করা। এগুলো কি তারেক বিন জিহাদের কাজ ? তারেক বিন জিহাদতো ছিল স্পেনর নির্যাতিত মুসলিমদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য সেই সুদূর আরব থেকে ছুটে গিয়েছিল। স্পেনে জিহাদের মাধ্যমে বিজয় করে ছিল। এখন কেউ যদি তারেক বিন জিহাদের পথ বাধ দিয়ে অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে সে কি তারেক বিন জিহাদের পথ অনুসরণ করল? এগুলো

কি সালাউদ্দিন আইয়ুবীর কাজ ? কে ছিল এই সালাউদ্দিন আইয়ুবি তিনি তো বাইতুল মোকাদাসকে কাফেরদের থেকে বাইতুল মোকাদাসকে মুক্ত করে ছিলেন ।তাহছারাও তিনি আরও অনেক ভূখণ্ড মুক্ত করে ছিলেন কাফেরদের থেকে এগুলো তিনি জিহাদের মাধ্যমে করেছিলেন। ঠিক তেমনি মুহাম্মাদ বিন কাশিম জিহাদের জন্য হিন্দুস্তানে এসেছিলেন এখন কেউ যদি মুহাম্মাদ বিন কাশিম এর অনুসারী দাবি করলো কিন্তু সে সেই অনুযায়ী কাজ করল না তাহলে সে মিথ্যা দাবি করল। এই খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ),সালাউদ্দিন আইয়ুবি, তারেক বিন জিহাদ, মুহাম্মাদ বিন কাশিম এই সকল বীরদের কথা শুদুমাত্র মুজাহিদরাই স্মরণ রেখেছে। তাই আলেমরা আমাদেরকে বার বার এই সকল বীরদের কথা স্মরণ করিয়ে বলে তোমাদেরকে তাদের মত হতে হবে এবং আবারো ভারত তথা হিন্দুস্তান বিজয় করতে হবে।

এগার নাম্বার কারণঃ আল কায়েদা হচ্ছে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত। দেখবেন পৃথীবিতে অনেক দল আছে যারা বেশি বারাবাড়ি করে ও বেশি ছাড়াছাড়ি করে থাকে। এক দল বলে থাকে গণতন্ত্র কুফরি না তারা মুরজিয়ার মত আকিদাহ পোষণ করে একটা মানুষ যখন লা ইলাহ ইল্লালা পাঠ করে তখন সে আর কখনো ইসলাম থেকে বের হয় না। আরেকটা দল রয়েছে যারা খাওয়া রিজিদের আকিদাহ পোষণ করে থাকে তারা বলে কবিরা গোনাহ করলে সে কাফের হয়ে যায়। এই দুইটা গ্রুপ একদল বারাবারি করছে আরেকটা দল ছাড়াছাড়ি করছে। কিন্তু তাঞ্জিম আল কায়েদা এই দুইটা থেকে আলাদা তারা মাঝামাঝি অবস্তায়ে আছে। আল কায়েদা বাড়াবাড়িতেও নেই ছাড়াছাড়িতেও নেই। আজকে আমরা দেখি শামের এবং ইরাকের কিছু গ্রুপ আছে যারা মুসলিমদের রক্তপাত করেছে বাড়াবাড়ি করার কারণে। আবার কিছু লোক আছে যারা গনতন্তের ভিতর দিয়ে ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা আবার ছাড়াছাড়ি করতেছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল কায়েদা এই দুই এর মাঝে অবস্তান করছে এই কারণেই আমরা আমাদের দল হিসেবে আল কায়েদাকে বাছাই করেছি। আল কায়েদার আরেকটা গুন হল তাদের মধ্যে দাম্বিকতা হিংসা এগুলো থেকে তারা মুক্ত। শাইখ উছামা বিন লাদেন (রঃ)ছিলেন আরবের ব্যক্তি এবং তিনি ছিলেন দাম্বিকতা থেকে মুক্ত । আবার আফগান শাইখ মোল্লা মুহাম্মাদ উমর (রঃ)

ছিলেন আফগানিস্তানের শাইখ তার কাছে শাইখ উছামা বিন লাদেন (রঃ) বাইয়াত দিয়েছিলেন। যদি উছামার বিন লাদেন (রঃ) দাম্বিকতা থাকতো তাহলে কখনো কি তিনি বাইয়াত দিতেন? আবার সোমালিয়ার মুজাহিদরা আমীর হিসেব মোল্লা মুহাম্মাদকে আমীর মানে। জাজিরাতুল আরব ইয়ামেনে মুজাহিদরা তারাও আমীর হিসেবে মোল্লা মুহাম্মদকে মানে শামের ভাইরা তারাও মোল্লা মুহাম্মাদকে আমীর হিসেবে মানে। বাংলাদেশেও যেই সকল ভাইরা আছে তারাও মোল্লা মুহাম্মাদকে আমীর হিসেবে মানে কারণ আমরা দাম্বিকতা ও হিংসা থেকে মুক্ত তাঞ্জিম আল কায়েদাও এই দাম্বিকতা থেকে মুক্ত। কিছুদিন আগে শাইখ আইমান আল জাওাহিরি (হাঃ) তিনি বলেছেন আমি আমার বাইয়াতকে নবয়ান করতেছি এবং আমি আমার বাইয়াতটা মোল্লা মুহাম্মাদ উমর এর হাতে।বিশ্বের অনেক দল মোল্লা মুহাম্মাদকে মানতে পারে নাই কারণ তাদের মধ্যে দাম্বিকতা আছে ফলে তারা বাইয়াত দিতে অস্বীকার করেছে শুদু তাই নয় তারা মুসলিমদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য সরজন্ত করতেছে। আলহামদুলিল্লাহ তাঞ্জিম আল কায়েদা কখনো এই কাজ করবে না তাদের আমীর শাইখ উছামা বিন লাদেন (রঃ)যার কাছে বাইয়াত দিয়ে গেছেন আজও তারা সেই আমীরের বাইয়াত এর উপর আছে। তাই বলা যায় আল কায়েদা এই সব দাম্বিক্তা,অহংকারী থেকে মুক্ত ।

বার নাম্বার কারণঃ যেই কারণে আমরা তাঞ্জিম আল কায়েদাকে আমাদের মানহাজ হিসেবে গ্রহন করেছি কারণ মুজাহিদরা যেই দলে আছে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে এখান থেকে হেদায়াত এর পথ দেখাবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদাবধ্য ।**আল্লাহ তালা বলেন, " যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করে" (সূরা আন কাবুত ৬৯)।** আজকে আল কায়েদা জিহাদ করে তাই অবশ্যই আল্লাহ তালা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ)বলেন হেদায়াত এর জন্য জিহাদটা আবশ্যক," **কেউ যদি হেদায়াত পেতে চায় সে যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করে আর এই জিহাদটা ইল্মের সকল রাস্তাগুলো বেষ্টন করে রেখেছে "** ।সুতারাং কেউ যদি বলে আমি সব ইল্ম অর্জন করে রাখছি কিন্তু সে জিহাদ করে না তাহলে সে সঠিক পথ পাবে না আল্লাহ অঙ্গীকারবধ্য যে জিহাদ করবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখাবে। ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল (রঃ) ও আব্দুল্লাহ

মুবারক (রঃ) বলেন " **যখন দেখবা মানুষ(দুইটা দল)কোন একটা বিষয় নিয়ে যগড়াতে(ইখতেলাপে) লিপ্ত রয়েছে তখন তাদেরকে অনুসরণ কর যারা** যুদ্ধ **প্রথম সারিতে রয়েছে। তারা যেভাবে আমল করছে তোমরাও সেভাবে আমল কর কারণ হকটা সব সময় মুজাহিদের সাতেই রয়েছে আর মুজাহিদরা যেটা বলে সেটাই সঠিক"** / সুতারাং এখানে ধরতে হবে মুজাহিদের কথা আর যেহেতু আল্লাহ মুজাহিদরকে হেদায়াত দিবেন সেহেতু আমরা তাঞ্জিম আল কায়েদাকে আমাদের দল হিসেবে বাছাই করেছি। আলহামদুলিল্লাহ,তাঞ্জিম আল কায়েদা ওই সংগঠন যারা পরিপূর্ণভাবে হকের উপর আছে এবং দ্বীনটাকে তারা আকড়ে ধরে আছে এবং সারা বিশ্বে জিহাদের মাধ্যমে মজলুম মুসলিমকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং তারা জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করে যাচ্ছে।। সুতারাং এই কারণ গুলোর কারণেই আমরা তাঞ্জিম আল কায়েদাকে আমদের দল হিসেবে বাছাই করে নিয়েছি। আল্লাহ আমাদেরকে সব সময় এই তাঞ্জিমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকার এবং বাতিলের আতংক হয়ে থাকার তফিক দান করুক .....আমিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৫৬৭

মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত দেশসমূহের জনসাধারণকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো:

শাইখ আনোয়ার আল-আওলাকি (রাহিমাহুল্লাহ)

শামেলি১৮৫৭

Junior Member

০৭-১৫-২০১৬

আমাদের পাঠকদের কাছে থেকে যেসব প্রশ্ন পাই তার উত্তর প্রদানের জন্য ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন আমার সাথে একটি ভিডিও রেকর্ডিং করার অভিমত ব্যক্ত করেছে। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত দেশসমূহের বেসামরিক জনসাধারনকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলার শরিয়াহগত বৈধতা নিয়ে। বিষয়টি বিভ্রান্তির জালে আচ্ছন্ন। অধিকন্তু বর্তমান সময়ের জিহাদে এটার গুরুত্ব ও সম্পৃক্ততার কারণে এ প্রশ্নের উত্তরে কুরআন, সুন্নাহর আলোকে এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর সাহাবী এবং পরবর্তিতে মুজাহিদিনদের জিহাদের বিভিন্ন কর্মপন্থা থেকে আমি এই প্রবন্ধটি লিখছি। একই সাথে আমরা বর্তমান সময়ে জিহাদের বাস্তবতাটা দেখব এবং এতে সফল হওয়ার জন্য কোন পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে নেয়া দরকার তাও দেখার চেষ্টা করব।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মাসআলা (ফিকহ) গুলোর সার–সংক্ষেপ আমি তুলে ধরছি –

* স্কলারগণ দারুল হারবের জনগনকে সামরিক এবং বেসামরিক লোক এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

* সামরিক লোকদেরকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা করা যাবে সকল স্কলারগন এই ব্যাপারে একমত। অন্যদিকে বেসামরিক লোকজন এই ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

* নারী এবং শিশুদের ইচ্ছাকৃতভাবে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না – এ ব্যাপারে স্কলারগণ একমত।

* বৃদ্ধ, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং দাসদের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় এ ব্যপারে স্কলারগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

* কিন্তু যদি নারী, বৃদ্ধ, কৃষক, ব্যবসায়ী কিংবা দাসরা যদি মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করে, অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে কিংবা মতামত জ্ঞাপন করে বুদ্ধিভিত্তিক কোনো সাহায্য প্রদান করে- তবে তাদের উপর হামলা করা বৈধ হয়ে যায়।

* সামরিক আর বেসামরিক লোকজন যদি একত্রে মিশে থাকে তবে সেখানে হামলার ব্যাপারে অনুমতি আছে যদিও নারী, শিশু, বৃদ্ধ, কৃষক, ব্যবসায়ী কিংবা দাস নিহত হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে এ হামলা যেন সামরিক লোকদের সাথে যুদ্ধের নিয়্যতেই হয়।

* মুসলিমদের দ্বারা যুদ্ধাবস্থায় কোন বেসামরিক লোক যদি নিহত হয় তবে এর দায়ভার মুসলিমদের উপর বর্তাবে না। এর জন্য মুসলিমদের কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না, হত্যার কোনো রক্তপণ দেয়া লাগবে না, এবং আল্লাহ্*র দৃষ্টিতেও এখানে মুসলিমদের কোনো পাপ নেই।

* যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা যুদ্ধাবস্থায় ভুলবশত কাফেরদের সাথে মুসলিমও মারা যায় তবে যে মুসলিমরা এ হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের এজন্য কোনো পাপ হবে না কিন্তু কাফফারা আদায় করতে হবে। এই কাফফারা হোল দু'মাস সাওম পালন করা অথবা ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানো। রক্তপণ আদায় করতে হবে কিনা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

* বেসামরিক লোকজন যদি যুদ্ধে বন্দী হয় তবে তাদের হত্যা করা উচিত না।
* কাফেররা আমাদের নীতিমালা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিপদে ফেলার জন্য ব্যবহার করবে-ইসলাম এই সুযোগ দেয় না।

* আলেমগণ যখন জিহাদের ফতোয়া দিবেন, সে ক্ষেত্রে চলমান জিহাদ বিবেচনা করে মুসলিমদের বিজয়কে সবসময় অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। বেসামরিক লোকদের হত্যার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে নিচে কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করা হোল।

* উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী এবং শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[১]

* রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন 'বৃদ্ধ, নারী কিংবা শিশুকে হত্যা করোনা।[২]

* রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের এক নিহত মহিলাকে দেখতে পেলেন এবং বললেন 'সে তো যোদ্ধা নয়'।[৩]

যেসব কাফেররা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে আমাদের আলেমগণ তাদেরকে 'মুকাতিলাহ' এবং 'গায়রে মুকাতিলাহ' পরিভাষা দুটো ব্যবহার করে আলাদা ভাগে ভাগ করে থাকেন যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় সামরিক আর বেসামরিক জনসাধারণ। কাফেরদের নারী এবং শিশুদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা যাবে না- এ ব্যাপারে আলেমগনের ইজমা আছে। তবে এখানে "ইচ্ছাকৃতভাবে" এই শব্দটি ব্যখ্যা করা প্রয়োজন কারণ এখানে বুঝার ঘাটতি থাকার কারণে নানা ধরণের বিভ্রান্তির জন্ম নেয় যেটা আজকে আমরা চারপাশে লক্ষ্য করছি। এখানে যেটা বুঝানো হয়েছে তা হলো হত্যার জন্য নারী এবং শিশুদের আলাদা করে বেছে নেয়া যাবে না; নারী এবং শিশু যুদ্ধে বন্দি হলে তাদের হত্যা করা উচিত নয় এবং যুদ্ধাবস্থায় ও যদি তাদের সামরিক বাহিনীদের থেকে আলাদা করা সম্ভব হয় তবে তা করা উচিত। কিন্তু তার মানে এই না যে, পুরুষ-নারী-শিশু সবাই একত্রে মিশে থাকলে তাদের উপর হামলা ইসলামে নিষিদ্ধ। এই ধারণা খুবই বিপদজনক এবং জিহাদের জন্য ক্ষতিকর এবং এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের মাঝে নারী-শিশু মিশে আছে বলে তাদের উপর হামলা করা বন্ধ করা খুবই কঠিন কাজ যা বর্তমান জিহাদের সীমাকে খুবই সংকীর্ণ করে ফেলে; একই সাথে এভাবে যুদ্ধ করা অসম্ভব এবং শত্রুদের তুলনায় মুসলিমরা অনেক অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। শত্রুপক্ষের বাড়িঘর আক্রমণ এবং তাদের শহর অবরোধ করা সম্পর্কে আলেমদের অভিমতসমূহ দেখলে আমরা বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম হব। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে 'বায়াত' নামক এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি ছিল। এটা ছিল রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষের উপর হামলা করা। আক্রমণকারীরা অতর্কিতভাবে শত্রুদের বাড়িঘরে কিংবা তাবুতে হামলা করত এবং লড়াইয়ে লিপ্ত হত। এ কারণে ঘরে কিংবা তাবুতে অবস্থানরত নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে নিহত হত কারণ এর মাঝে নারী-পুরুষ-শিশু পার্থক্য করা খুবই কঠিন। এখন, এ ধরণের যুদ্ধ কি ইসলাম অনুমোদন করে? 'বায়াত' যুদ্ধে নারী-শিশুরা যে

হামলার শিকার হচ্ছে এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। একটি সহিহ বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত"। অর্থাৎ হত্যার অনুমতির ব্যাপারে যুদ্ধরত পুরুষদের উপর যে হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবীদের এই ধরনের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন যেখানে পুরো পরিবারই নিহত হচ্ছে। সালামাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি নিজে নয়টি পরিবারের সকল লোককে হত্যা করেছি'।[৪] ইমাম আহমদ (রহঃ) কে 'বায়াত' এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন 'এবং রোমানদের বিরুদ্ধে বায়াত ছাড়া কি কোনো যুদ্ধ হয়েছিল?'[৫]

অর্থ্যৎ ইমাম আহমদ (রহঃ) বায়াত এর সমর্থন করছেন শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলছেন যে মুসলিমরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রায়শ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা হল 'বায়াত'। যে দেশগুলো আজ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে সেখানকার কোনো জনবহুল এলাকায় বোমা নিক্ষেপ কিংবা বিস্ফোরণ আর 'বায়াত এর মাঝে কার্যত কোন পার্থক্য নেই'। যেমনিভাবে সাহাবারা এবং পরবর্তীতে তাদের অনুসারীদের জন্য পুরুষ-নারী-শিশু আলাদা করতে না পারা সত্ত্বেও এই 'বায়াত' যুদ্ধের অনুমতি ছিল তবে কেন আমরা কাফেরদের (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত) দেশের কোন জনবহুল এলাকায় বোমা নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করব? 'বায়াত' এর ব্যাপারে স্কলারগণের ইজমা (ঐক্যমত) থাকার বিষয়টি আমরা ইমাম আহমদের (রহঃ) আরেকটি বক্তব্য থেকে জানতে পারি। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন "আমরা এমন কারো কথা জানিনা যিনি 'বায়াত' কে নিরুৎসাহিত করেছেন।'[৬]

আমাদের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি উদাহরণ হলো যুদ্ধে ব্যবহৃত গুলতি (ভারী পাথর নিক্ষেপের যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ) যা কাফেরদের শহরে হামলার জন্য ব্যবহৃত হত। সিরাহ বর্ননাকারী আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়িফে (তায়িফে প্রচীর দিয়ে ঘেরা ছকীফ আক্রমনের সময়) গুলতি ব্যবহার করেছিলেন এবং আমর ইবনে আস (রাঃ) ও মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় যুদ্ধের সময় এটা ব্যবহার করেন। গুলতির নিক্ষিপ্ত বস্তু (বড় বড় পাথর বা আগুনের গোলা কিংবা অন্য কোন বস্তু) নগরীতে আঘাত হানে এবং এতে নারী-পুরুষ কিংবা শিশুদের আলাদা করার কোনো সুযোগ থাকে না।

শত্রুদের বিপক্ষে এ ধরনের গুলতি ব্যবহারের ব্যাপারে ইবনে রুশদের একটি বাক্য দ্বারা সারমর্মে পৌঁছানো যায়। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা আছে যে কাফেরদের দুর্গে গুলতি দিয়ে আক্রমন করা বৈধ যদিও তাদের মাঝে নারী–শিশু থাকুক কিংবা না থাকুক। কারণ আমাদের নিকট দালিল আছে যেখান থেকে জানতে পারি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়িফে কাফেরদের বিরুদ্ধে গুলতি ব্যবহার করেছিলেন।[৭]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন " আমাদের কাছে বর্ণনা আছে যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়িফে গুলতি ব্যবহার করেছেন। তাই নারী-শিশু তাদের সাথে অবস্থান করছে বলে আক্রমণ করার ব্যাপারে যদি নিষেধাজ্ঞা থাকত তবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জানাতেন। তায়িফের এই বর্ণনাসহ অন্যান্য বর্ণনাগুলো এখনও ভালোভাবে সংরক্ষিত আছে যা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ এবং সিরাহ থেকে সকলেই জানে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ এবং তাঁদের অনুসারীরাও আমাদের আগে থেকেই কাফেরদের দুর্গে আক্রমন করতে এটা ব্যবহার করেছেন। এরকম কোন বর্ণনা আমাদের কাছে নেই যা প্রমাণ করে যে তাঁরা নারী-শিশু কিংবা অন্য যে কেউ যাদের সাধারণত হত্যা করা উচিত নয় তাদের অবস্থান করার কারণে গুলতি কিংবা অন্য কোন রকম অস্ত্র দিয়ে নগর-দুর্গ আক্রমণ করা বন্ধ করেছেন। ইমাম আল মাউয়ারদি (রহঃ) বলেন, নারী-শিশুদের হত্যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা যুদ্ধে বন্দীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে কারণ এরা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ (গনীমাহ, booty)। কিন্তু যখন এই নারী-শিশু যুদ্ধরত এলাকায় (যুদ্ধের ময়দানে) অবস্থান করে তবে তাদের পুরুষদের সাথে তাদের উপরেও হামলা করা যাবে কারণ যুদ্ধের ময়দানে এ ধরনের আক্রমণ অনুমোদিত।[৮]

তাই প্রয়োজনে এই ধরনের গুলতি বেসামরিক লোকদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে বলে আলেমগণ বলেছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন যে, যদি মুসলিমরা দুর্গের কিংবা শহর থেকে বেশ দূরত্বে অবস্থান করে তবে তাদের শুধু দুর্গের প্রাচীরে পাথর কিংবা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা উচিত; কাফেরদের বাড়িঘরের উপরে নয়।[৯]

তবে, যদি প্রাচীরের কাছাকাছি চলে আসে তখন তাদের বাড়িঘরের উপর লক্ষ্য

করে নিক্ষেপ করা যাবে। 'বায়াত' এর মত এই গুলতির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বেসামরিক লোকদের জীবন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। গুলতি যে গোলা নিক্ষেপ করে তা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী কোনো অস্ত্র না তাই মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত জাতিসমুহের শহরে বোমা বিস্ফোরণ কিংবা নিক্ষেপ করার সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। তাই উপরোক্ত দুটি দালিল থেকে এটা পরিস্কার যে, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত দেশের জনসাধারনের উপর মুসলিমদের বোমা বিস্ফোরণ, রাইফেল বা বন্দুক কিংবা অন্য কোনো উপায়ে হামলা করা জায়েজ যদিও তা তাদের বেসামরিক লোকদের মৃত্যুর কারণ হোক না কেন। লক্ষ্য করবেন, 'শত্রুরা আমাদের সাথে যে আচরণ করবে আমরাও সে আচরন করব', এই ব্যাপারে এখনো আমি কোন দালিল উপস্থাপন করিনি। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদের উপর যে হামলা চালিয়েছে এই দালিল নিয়ে আসলে তাদের জনসাধারনের পক্ষে যারা আজ তর্ক করছে তাদের কথা বলার কোনো সুযোগই থাকবে না। মূল দালিলগুলোর দিকে নজর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ যেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের মূলধারার (ক্লাসিকাল, পুর্বের) আলেমগণ জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করেছেন তবেই আমরা বুঝতে পারব বর্তমান সময়ের আলেমদের তুলনায় কেন তারা ভিন্ন উপসংহারে এসে উপনীত হয়েছিলেন।

ইমাম আবু জাকারিয়া আল আনসারি (রহঃ) বলেন, 'কাফেরদের দুর্গ আক্রমণের উদ্দেশ্যে গুলতি ব্যবহার করা যাবে যদিও তা বেসামরিক লোকদের উপর আঘাত হানে যেন তারা জিহাদকে থমকে দিতে এদের (বেসামরিক) ব্যবহার করতে না পারে অথবা তাদের (বেসামরিক) দিয়ে দুর্গ রক্ষার ছলচাতুরী করতে না পারে।'[১০]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'কোন শহর কিংবা দুর্গে যদি কোনো মুসলিম, মুসলিম যুদ্ধবন্দী, ব্যবসায়ী, কিংবা শান্তি চুক্তিবদ্ধ কাফের থাকে কিংবা উপরে উল্লিখিতদের কোনো দল থাকে তবে সেখানে গুলতি কিংবা অনুরূপ কোনো কিছু দিয়ে কি আঘাত হানা যাবে? ফিকহের মাযহাবসমুহ এ ব্যাপারে কয়েকটি মত দিয়েছে। প্রথমত, যদি তাদের আক্রমণ করার প্রয়োজন না হয় তবে এ ব্যাপারে শক্তিশালী মত হচ্ছে আক্রমণ না করা। তবে, তা নিষিদ্ধ করা হয় নি। এর কারণ হল অবিশ্বাসীদের মধ্যে একজন মুসলিম থাকার কারনে যেন জিহাদ থেমে না যায়। যদি কোনো ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা থাকে অথবা তাদের দুর্গে প্রবেশের অন্য কোন উপায়

না থাকে তবে নিঃসন্দেহে তাদের উপর আক্রমন করা বৈধ। মাজহাবের দ্বিতীয় মত অনুযায়ী কোন ধরনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করার দরকার নেই। যদি তাদের আক্রমনের ফলে কোন মুসলিম মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তাদের আক্রমন করা উচিত হবে না, আর আশঙ্কা না থাকলে সেখানেও দুইটি মত আছে। তৃতীয় মত যা আল-শামিল এর লেখক উল্লেখ করেছেন তা হল যদি সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা তাদের সমান হয় তবে তাদের আক্রমন করা আমাদের উচিত হবে না। কিন্তু মুসলিমদের সংখ্যা যদি কম হয় তবে আমরা তাদের আক্রমন করতে পারব, কারণ সেক্ষেত্রে সিংহভাগ ক্ষতি মুসলিমদের হবে না। এ ব্যাপারে মাজহাবের অবস্থান যা আল-মুখতাসার এ উল্লেখ করা আছে তা হল, তাদের আক্রমন করা বৈধ যদিও সেখানকার মুসলিমদের ক্ষতি হয়, কারণ আমাদের পক্ষের মুসলিমদের পবিত্রতা সেখানকার মুসলিমদের চেয়ে বেশি। যদি কোন মুসলিম নিহত হয় তবে সে শহীদ হবে।'[১১]

ইমাম ইবনে কুদামাহ আল মাক্বদিসি (রহঃ) বলেন, 'যদি তারা (শত্রুরা) যুদ্ধে নারী শিশু বা অন্য কাউকে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তবে যোদ্ধাদের মারার উদ্দেশ্যে তাদের লক্ষ্য করে আঘাত করা বৈধ। এর কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে নারী-শিশু থাকা সত্ত্বেও গুলতি ব্যবহার করেছিলেন। এর কারণ হল, যদি এই কারণে মুসলিমরা তাদের আক্রমন না করে তবে তা জিহাদে সমস্যার সৃষ্টি করবে। কারণ, শত্রুরা যখনই মুসলিমদের হুমকির সম্মুখীন হবে তখনই তারা এইটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। যুদ্ধের সময়ে যেকোনো মূহুর্তেই আঘাত করা বৈধ। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঘাত হানার সময় যুদ্ধ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকেননি।'[১২]

ইমাম ইবনে কুদামাহ আল মাক্বদিসি (রহঃ) আরও বলেন, 'আলী ইবনে আবি তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত-তায়িফের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে গুলতি ব্যবহার করেছিলেন। শত্রুকে পানি দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়ার কৌশলটিও একই ধাঁচের। যদি তাদের মাঝে মুসলিম অধিবাসী থাকে এবং এসকল কৌশল ব্যবহার না করেই জয়লাভ করা যায় তবে সেগুলো ব্যবহার না করাই উচিত হবে। কারণ এতে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত হবে। কিন্তু যদি এই কৌশল গুলো ছাড়া জয়লাভ করা না যায় সেক্ষেত্রে এসকল কৌশল ব্যবহার

করা বৈধ। কারণ এগুলোকে নিষেধ করলে তা প্রকারান্তরে জিহাদকেই নিষ্ক্রিয় করে দিবে।'[১৩]

জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি যে অন্যান্য বিষয়গুলোর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরার জন্যই আমাদের প্রাথমিক যুগের আলেমদের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। এর মাধ্যমে এও প্রমাণিত হয় যে, যে সকল বিষয় জিহাদকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন করে তার সবকিছুই রহিত হয়ে যাবে। অনেক আধুনিক আলেমরা কিছু অপরিবর্তনীয় নীতিমালার অবতারণা করেছেন যা অনুসরণ করতে গেলে জিহাদ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নীতি নৈতিকতাহীন শত্রুদের বিপক্ষে মুসলিমরা অসুবিধাজনক অবস্থানের মুখোমুখি হবে।

জিহাদের ব্যাপারে বর্তমানকালের (কথিত) আলেমদের কিছু নিষেধাজ্ঞা নিম্নরুপঃ

- রাজা বা প্রেসিডেন্টের/ খলিফার নির্দেশ ছাড়া জিহাদ করা যাবে না।
- আত্মঘাতী হামলা বৈধ না।
- অবিশ্বাসী নারী-শিশুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন সকল অভিযান অবৈধ।

প্রথম নিষেধাজ্ঞাটিই জিহাদ থামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ বর্তমানকালের কোনো রাজা বা রাষ্ট্রপতি (যারা নিজেরাই মুরতাদ) জিহাদের অনুমতি দিবে না। তারা শুধু সেসকল যুদ্ধের অনুমতি দিবে যেগুলো তাদের নিরাপত্তা দিবে এবং তাদের ব্যক্তিগতভাবে লাভবান করবে। আল্লাহ্*র রাস্তায়, ইসলামের উন্নতির জন্য কিংবা মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধের ব্যাপারে তারা খুব একটা আগ্রহী নয়। বাকি দুটো নিষেধাজ্ঞা এখনকার মুজাহিদীনদের জন্য সম্ভাব্য অধিকাংশ কৌশলকেই অবৈধ করে দেয়। ইমান ইবনু রুশদ বলেন যে, নারী-শিশুর উপস্থিতি নির্বিশেষে শত্রুর দুর্গে গুলতি ব্যবহার করার ব্যাপারে ফিকহশাস্ত্রবিদদের মধ্যে ইজমা রয়েছে। ইমাম আল-শাফেঈ (রহঃ) বলেন, এটাই মুসলিমদের এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবিদের অনুসৃত পন্থা ছিল। কাফিরদের দুর্গ আক্রমণের ব্যাপারে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যেখানে নারী-শিশু বা অন্য কারো নিহত হওয়া ঠেকাতে গুলতি বা এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, 'রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বায়াত ছাড়া আর কী?' অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী-শিশু মারা গেলেও কাফিরদের ভূমি আক্রমণের ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কৌশল এমনই ছিল। খুলাফায়ে রাশিদিন, উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং আইয়্যুবী খলিফা, স্পেইনের মুসলিম এবং মামলুকরাও রোমানদের সাথে যুদ্ধে এই কৌশল অবলম্বন করত। উসমানিরাও কাফিরদের শহর-নগর অবরোধের সময় এই পন্থা কাজে লাগাত। তাহলে কীভাবে আমরা ১৪০০ বছরের যুদ্ধ কৌশল জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে আজকের যুগে জিহাদের নতুন নিয়ম বানাতে পারি? মুসলিমরা যা করেনি তা হলো তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বা আত্মসমর্পণ করার পর বন্দী অবস্থায় তাদের হত্যা করেনি। এই বিষয়ে পরিস্কার ধারণা রাখা এই যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বেসামরিক লোকের মৃত্যু ঠেকাতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য লক্ষ্যে আক্রমণ চালানো বন্ধ হয়ে যাবে। আর শুধুমাত্র সুরক্ষিত সামরিক লক্ষ্যে আক্রমণ করাটা আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের সমস্যায় ফেলে দিবে।

উপরোক্ত প্রমাণ অনুযায়ী যে সকল যুদ্ধ কৌশল বৈধঃ

• মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত দেশসমূহের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিস্ফোরক ব্যবহার করা বৈধ। বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রভাব গুলতির সাথে তুলনীয়। গুলতি দিয়ে ছোঁড়া মিসাইলগুলো ছিল প্রধানত পাথর। এই পাথরের আঘাতে বা এর বিক্ষিপ্ত অংশের আঘাতে শত্রুরা আক্রান্ত হত। কখনো কখনো গুলতির মিসাইল হিসাবে দাহ্য পদার্থে পূর্ণ পাত্র ব্যবহার করা হত যা শত্রুদের আগুনে পুড়িয়ে মারত। কিছু সংখ্যক আলেম বিস্ফোরক এর ব্যবহার কে শত্রুর বিরুদ্ধে আগুনের ব্যবহারের সমতুল্য বলেছেন, কিন্তু তা পুরোপুরি সঠিক নয়।[১৪]

এটা সত্য যে বিস্ফোরক প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে তবে বেশিরভাগ মৃত্যুই হয় ছোড়া পাথরের বিক্ষিপ্ত অংশ এবং বিস্ফোরনের কম্পনে। বিস্ফোরণের তাপের ফলে সবচেয়ে কম সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়। প্রায় সব বিস্ফোরকের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর কারণ তাপ হোক কিংবা ছোড়া পাথরের বিক্ষিপ্ত অংশ হোক আইনগত দিক থেকে বিস্ফোরক এর ব্যবহার গুলতি ব্যবহারের অনুরূপ।

• বিভিন্ন অপারেশানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাবহারের অনুমতি রয়েছে যেমনটা মুম্বাই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল সাধারণ জনগনকে লক্ষ্য করে। এটি উপরে

আলোচিত বায়াত কৌশলের অনুরুপ। যে গুলি করবে সে ভীড়ের মধ্যে এলোপাতাড়ি ভাবে গুলি করতে পারবে তবে লক্ষ্য যদি পরিস্কার থাকে অবশ্যই তাকে নারী এবং শিশু হত্যা এড়িয়ে যেতে হবে।

• জনবহুল স্থান গুলোতে বিষাক্ত গ্যাস কিংবা রাসায়নিক পদার্থ এবং বায়োলজিকাল অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যাপক কার্যকারিতার বিবেচনায় এদের ব্যবহারের পক্ষে জোর সমর্থন দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের গুরুত্ব এবং অনুমোদনযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী আলেমগণরা যা বলেছেনঃ

-ইমাম আল মাওয়ার্দি (রহঃ) বলেন, 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের পর আত-তায়িফ অবরোধ করার সময় গুলতি ব্যবহার করেছিলেন। শত্রুদের অসতর্ক অবস্থায় তাদের উপর (তারা যে সকল শহর বা গ্রামে থাকে) অতর্কিতে হামলা করার অনুমতি আছে যেমনটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন বানিয়াল মুস্তালাকদের বিরুদ্ধে। শত্রুদের উপর রাতের বেলায় হামলা করা, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, তাদের দিকে আগুন নিক্ষেপ করা, সাপ এবং বিছা নিক্ষেপ করাও বৈধ। তাদেরকে ভিতরে রেখে তাদের বাড়ি ঘর ধ্বংস করে ফেলা, পানির তোড়ে ভাসিয়ে দেওয়া, তাদের পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া, এবং যা যা তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে তার সবই করার অনুমতি রয়েছে। তাদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যেতে হবে এতে হয়ত তাদের নারী ও শিশুদের মৃত্যু হতে পারে তবে শুধু এ থেকে বিরত থাকতে গিয়ে অর্থাৎ শুধুমাত্র এই কারণে তাদের উপর আক্রমণ চালানো বন্ধ করা যাবেনা। এর কারণ হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী এবং শিশুদের কারণে বনি মুস্তালাক অথবা আত-তায়িফ এর উপর আক্রমণ পরিচালানা বন্ধ রাখেননি। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী এবং শিশুদের কে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যার করার নির্দেশ দেননি। নারী এবং শিশুদের গণিমতের মাল হিসেবে পাওয়া গেলেও হত্যা করা যাবেনা। শুধুমাত্র যখন তারা দারুল-হারবে বসবাস করবে তখন তাদের দিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হালাল এবং তাদের ক্ষেত্রেও পুরুষদের মতো একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।'[১৫]

-ইমাম আল-সারখাশি (রহঃ) (একজন হানাফী আলেম) শারহ আল-সায়রাল কাবির থেকে মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান (রহঃ) এর একটি উদ্ধৃতি দেনঃ আগুন দিয়ে অবিশ্বাসীদের ভবন পুড়িয়ে ফেলা, তাদেরকে পানি দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া, তাদের পানিতে রক্ত বর্জ্য এবং বিষ মিশানো যতক্ষন পর্যন্ত না পানি দূষিত হচ্ছে- এসব মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত। কারণ আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন তাদের কাবু করতে এবং তাদের শক্তিমত্তাকে অকার্যকর করে দিতে। এ যাবৎ যুদ্ধের যত গুলো কৌশলের কথা বলা হল এর সব গুলোই তাদের কে দুর্বল করে তুলবে এবং এর ফলে আল্লাহর আদেশ পালিত হবে এবং আল্লাহ কে অমান্য করা হবেনা। এই সব কৌশল শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং এগুলো হল পুরস্কার প্রাপ্তির একটা উপায়।

আল্লাহ্* বলেন, 'তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল।'[১৬]

কোনো মুসলিম বন্দি, শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো জাতির নাগরিক, নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেউ আছে এটা জানা থাকার পরেও উপরে বর্ণিত কোনো পদ্ধতিই নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। কারণ এক্ষেত্রে একই সাথে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানো এবং কাফিরদের অবদমিত করার নির্দেশ পালন করা সম্ভব নয়। আর যা এড়ানো সম্ভব নয় তা মাফ করে দেওয়া হবে।

-ইমাম ইবনু ফারহুন (রহঃ) (মালিকি মাযহাবের আলেম) বলেন, 'শত্রুকে সকল উপায়ে মোকাবিলা করতে হবে। তাদের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে যদি অন্য কোনো উপায় না থাকে তবে আগুন দিয়ে হলেও মোকাবিলা করতে হবে। তাদের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে সেক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে। তবে ভেতরে মুসলিমরা থাকলেও তাদের জাহাজ এবং দুর্গ গুলতি দিয়ে আঘাত করা আমাদের জন্য বৈধ। এবং এ ব্যাপারে তর্কের কোনো অবকাশ নেই।'[১৭]

-ইমাম আল-খারশি (রহঃ) (মালিকি মাযহাবের আলেম) বলেন,' আমাদের দাওয়াত গ্রহণ না করলে সম্ভাব্য সকল উপায়ে শত্রুর মোকাবিলা করা বৈধ। তাদের পানি সরবরাহ আটকে দিয়ে তৃষ্ণায় মেরে ফেলা, পানির তোড়ে ডুবিয়ে দেওয়া,

তলোয়ার, ছুরি দিয়ে আঘাত করে কিংবা গুলতি এবং অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে মেরে ফেলা বৈধ।'[১৮]

-ইমাম আল-শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'শত্রুপক্ষ পাহাড়, দুর্গ, গিরিখাত, কিংবা কাঁটাযুক্ত গাছের নিচে বা অন্য কোনো আশ্রয় গ্রহণ করলে তাদের গুলতি, আগুন, বিছে, সাপ এবং ক্ষতিকারক সবকিছু দিয়েই আঘাত করা বৈধ। তাদের ডুবিয়ে মারার উদ্দেশ্যে বা কাদায় আটকে ফেলার উদ্দেশ্যে পানির স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়াও বৈধ। সেখানে নারী-শিশু বা ধর্মীয় যাজকেরা থাকুক বা না থাকুক এতে কিছু আসে যায় না। কারণ, সেই ভূমি ইসলাম দ্বারা সুরক্ষিত নয় বা ইসলামের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ নয়। তাদের ফলের গাছ এবং অন্যান্য বৃক্ষ, বাড়িঘর এবং তাদের মালিকানাধীন জড় যেকোনো বস্তুই ধ্বংস করা অনুমোদিত।'[১৯]

-ইমাম আল-বাহুতি (রহঃ) (একজন হাম্বালি মাযহাবের আলেম) বলেন, 'তাদেরকে (কাফিরদের) আগুন, সাপ, বিছে, গুলতি দিয়ে আঘাত করা, সুড়ঙ্গ ধোঁয়ায় পূর্ণ করা, বন্যার তোড়ে ডুবিয়ে দেওয়া এবং তাদের দুর্গ ও বাড়িঘর ধ্বংস করা বৈধ। তবে আগুন ব্যবহার না করেই তাদের হারানো গেলে আগুন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।'[২০]

-ইমাম আল-শাওকানি (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং এর জন্য কোন পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করে দেননি। কি করা যাবে আর কি করা যাবেনা এই বিষয়ে আল্লাহ আমাদের কোন আদেশ দেননি। সুতরাং তাদের কে যে কোন উপায়ে হত্যা করতে কোন রকম বাধা নেই সেটা গুলির মাধ্যমে হোক ছুরিকাঘাতে হোক, পানিতে ডুবিয়ে হোক, তাদের ভবন গুলো তাদের উপর ধসিয়ে দিয়ে হোক কিংবা তাদের কে উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিয়ে হোক না কেন।'[২১]

আলেমদের এই বক্তব্যগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, বিষ প্রয়োগ বা মানুষ হত্যার অন্যান্য পদ্ধতি গুলো যে সকল অবিশ্বাসীরা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। এর পাশাপাশি তাদের বক্তব্যগুলোতে আরো অনেক অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে যা থেকে একজন বিশ্বাসী লাভবান হতে পারে।

মুজাহিদীনদের উচিত মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলো বিশেষ করে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে যেমন- ইউ.এস.এ, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরক, বিষ, আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য সকল উপায়ে আক্রমণ চালানো এবং

তাদের সর্বোচ্চ ক্ষতি করা। আমাদের এই সময়ে আল্লাহ্*র ইবাদাত করার এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

রেফারেন্স সমূহঃ

[১] বুখারি ও মুসলিম

[২] গ্রহণযোগ্য সনদ সহ আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত

[৩] আবু দাউদ এবং আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণতি, সহীহ

[৪] মু'জিম আল-তাবারানি

[৫] আল-মুগনি, ইবনু আল-কুদামাহ

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] বিদায়াত আল-মুজতাহিদ

[৮] আল-উম্ম

[৯] প্রাগুক্ত

[১০] আসনা আল-মাতালিব

[১১] রাওদাত আল-তালিবিন

[১২] আল-শারহ আল-কাবির

[১৩] আল-কাফি

[১৪] আলেমরা এই দলিল ব্যবহার করছেন যে রাসুল (স) আগুন দিয়ে শত্রুকে শাস্তি দেওয়া নিষেধ করেছেন। (সহীহ)

[১৫] আল-হাওল আল-কাবির

[১৬] সূরা আত-তাওবাহঃ ১২০

[১৭] তাবসিরাত আল-হুকাম

[১৮] শারহ খালিল

[১৯] আল-উম্ম

[২০] কাশফ আল- ক্বিনা

[২১] আল সায়ল আল-জাররার

পোস্ট লিংক https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৬০২

কেনো আল কায়েদা-তালেবান ইসরাইল হামলা করছে না...???

Mutmain

Junior Member

০৭-০৭-২০১৬

একটি প্রশ্ন বার বার করা হয় যে, কেনো তালেবান-আলকায়দা ইসরাইল হামলা করে না?

ইনশা-আল্লাহ কুরআন-সুন্নাহ- ও ইতিহাস-বাস্তবতার আলোকে এর জবাব দিবো।

৩]কুরআন করীম থেকেঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদের যাদেরকে নিকটে পাও তাদের সাথে লড়াই করো। [সুরা তাওবাহ- ১২৩]

দেখুন, এই আয়াতে নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে। আপনি যদি এই দৃষ্টিকোণে তালেবান-আলকায়েদার উপর চোখ রাখেন, তাহলে দেখবেন, তারা তাদের নিকটবর্তী কাফিরের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আফগানে আমেরিকার নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে। সিরিয়ায় বাশার-ইরানি রাফিজি, রাশিয়া-আমেরিকার বিরুদ্ধে। সোমালিয়ায় কেনিয়া, উগান্ডা, ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে। মালিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। এভাবে প্রতিটি জায়গায় নিকটবর্তী কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছে। মনে রাখুন, আলকায়েদা একটি সংগঠন, রাষ্ট্র নয়। তাই সংগঠন যেভাবে বিস্তার লাভ করে, আলকায়েদা সেভাবে বিস্তার লাভ করে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুন্নাহ থেকেঃ

ইসলামের প্রথমযুগে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিতহয়েছেন মক্কায়। যার কারণে মুসলমানদের সবাই মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় গিয়েই রাসুল্লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করেন। তখনো মক্কায় কিছু দুর্বল মুসলমান ছিলেন।

এরপরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারাবাহিকভাবে ছোট ছোট গোত্র যেমন-বনু কুরাইজা, বনু নজীর, বনু কায়নুকা এবং খাইবার অবশেষে একপর্যায়ে হিজরতের ৮ম বছরে মক্কা জয় করেন।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যে, যেহেতু তখন মক্কার কাফেররাই ছিলো ইসলামের ঘোর দুশমন, তাহলে কেনো প্রথমে মক্কায় হামলা করলেন না? তা জয় করলেন না?

যে কারণে মক্কায় তখন হামলা করা হয় নি, বর্তমানে ঠিক একই কারণে ইসরাইল-আমেরিকায় হামলা করা যাচ্ছে না। তবে তাদের মধ্যে যাদেরকেই নিকটে পাওয়া যাচ্ছে তাদের উপরই হামলা করা হচ্ছে।

ইতিহাসে পাতা থেকেঃ

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রাহ যখন বায়তুল মুকাদ্দস উদ্ধারের জন্যে জিহাদ শুরু করেন। তখন তার উদ্ধারের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হয় তখনকার শীয়া, মুনাফিক ও দালাল শাসকরা। তিনি প্রথমে এই দালাল শাসকদের মূলোৎপাটন করে মিসর-সিরিয়াকে এক করেছেন, অত:পর বায়তুল-মুকাদ্দস উদ্ধার করেছেন। ঠিক তদ্রুপ বায়তুল মুকাদ্দস উদ্ধারের প্রথম বাধা এই দালাল. মুনাফিক ও শীয়া শাসকগোষ্ঠী বাশার-সিসিগং। এদেরকে পরাজিত করা ব্যতীত বায়তুল মুকাদ্দস উদ্ধার করা কঠিন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জিহাদের ফতোয়া দেন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহ'। ১৮০৩ সালে। তখন জিহাদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ'র নেতৃত্বে একটি মুজাহিদবাহিনী বের হয়। ১৮২৪ সালে। এরা প্রথমে সীমান্তবর্তী এলাকায় বিভিন্ন কারণে ঘাঁটি গাড়েন। পরে সেখান থেকেই জিহাদের সূচনা করেন। এক্ষেত্রে প্রথমে তাদের বাধা হয়, শিখ ও মুসলিম নামধারী দালালরা। তিনি প্রথমে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন, একপর্যায়ে শহীদ হন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ হয় নি। ঠিক এভাবে যখন শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহ, ১৯৯৮ সালে আমেরিকার

বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন তখন এই দালাল নামধারী মুসলিম শাসকরা প্রথমে বাধা হয়, এরাই আমেরিকার স্বার্থে মুজাহিদদের বাধা দেয়। এজন্যে মুজাহিদরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হন।

আশা করি এতটুকু আলোচনার পর আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন।

এখন আমি দেখাতে চাচ্ছি, যে, তালেবান-আলকায়েদার এখন পর্যন্ত ইসরাইলের বিরুদ্ধে কী কী করেছে:

শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহ যখন আফগানিস্তানে হিজরত করেন, তখন এই মহান মুজাহিদের সম্মানে ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তানে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রাহ এর উপস্থিতিতে একটি গার্ড অফ অনারের ব্যবস্থা করা হয়, ওই সময় মোল্লা উমর রাহ বলেন,

'আমাদের লক্ষ্য শুধু আফগানিস্তান নয়, বরং চেচনিয়া, আরাকান. কাশ্মীর ও ফিলিস্তিন আমাদের গন্তব্য'।

শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহ বলেন, *'আমাদের ফিলিস্তিনের ভায়েরা! নিশ্চয় তোমাদের রক্তই আমাদের রক্ত, তোমাদের সন্তানেরাই আমাদের সন্তান। আমরা তোমাদেরকে কখনোই অপদস্থ হতে দেব না। হয় তো বিজয় আসবে, নয় তো আমরা ওই শাহাদাত গ্রহণ করবো যা হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করেছেন।'*

আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের হামলার পর তিনি বলেন, *'কসম ওই আল্লাহর! যিনি আকাশকে খুটিবিহীন দাড় করিয়েছেন। আমেরিকা এবং সেখানে বসবাসরতরা ততদিন পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে পারবে না, যতদিন না আমরা ফিলিস্তীনে শান্তিতে থাকতে পারবো!*

আর যতদিন না সমস্ত কাফিররা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভুমি থেকে বের হবে।'

আলকায়েদার বর্তমান প্রধান শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ ফিলিস্তিনকে নিয়ে অনেক বার্তা দিয়েছেন, এরমধ্যে একটি বার্তার শিরোনাম হচ্ছে, *'ফিলিস্তিন আমাদের এবং প্রতিটি মুসলমাদের ইস্যু'।*

একথা সবারই জানা যে যাযাবর ইয়াহুদিদের কলোনি ইসরাইল হচ্ছে আমেরিকা নামক পাখিরই একটি ডানা, সুতরাং পাখি মরে গেলে ডানা তো এম্নিতেই নাই হয়ে যাবে!!!

এবার ফিলিস্তিনকে আলকায়েদার কার্যকর কিছু পদক্ষেপের কথা বলছি।

এখন কিছু জিহাদিগ্রুপের কথা উল্লেখ করবো যারা বিভিন্ন সময় ইসরাইল হামলা করে।

১- গাজায় আল কায়েদার একটি শাখা আছে, যার নাম হচ্ছে নাসির সালাহুদ্দীন ব্রিগেড। যারা এখনো প্রকাশ্যে বিভিন্ন কারণে আল কায়েদার হাতে বাইয়াহ দেয় নি। তবে আল কায়েদার মানহাজ অনুসরন করে। যেমন - তাদের পতাকা কালো,তারা নিজেদের প্রয়োজিত ভিডিও তে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে না। গাজায় ইসরাইলের সর্বশেষ হামলার তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন চালিয়েছে।

২- লেবাননে আল কায়েদার অনুসারী হচ্ছে আব্দুল্লাহ আযযাম ব্রিগেড। যারা বিভিন্ন সময় ইসরাইলকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি রকেট ছুড়েছে।

৩-মিসরে হচ্ছে আন্সারুল বায়তিল মাকদিস। তারা বেশ কয়েকবার ইসরাইলের গ্যাসলাইনে আগুন ধরিয়েছে। এ ছাড়াও তারা বিভিন্ন সময় ইসরাইলে হামলা করে।

৪- সিরিয়ায় আছে জাবহাতুন নুসরা। এরাতো এখন আমেরিকা-রাশিয়া-বাশারের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের আমীর বারবার বলেছেন, তাদের লক্ষ্য ফিলিস্তিন।

.এবার ইনবক্সে এক ভায়ের বার্তা দিয়ে লেখাটি শেষ করছি, ওই ভাই পাঠিয়েছেন- ‘উইকিপিডিয়ার একটি পেইজ আছে। যার টাইটেল দেওয়া "list of islamist terrorist attacks" (তাদের কাছে যা টেরোরিস্ট এটাক মনে হয় আর কি!) উইকিতে ঢুকে এই শিরোনামে সার্চ করলেই হলো। এই পেইজে ১৯৮০ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে মুজাহিদরা দুশমনের উপর যত হামলা করেছে তার সবই বা অধিকাংশ লিপিবদ্ধ করা। আপনি শুধু একবার সেখানে চোখ বুলান। ওয়াল্লাহি! আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে! যত ধরনের ছোট বড় হামলা হয়েছে তার বেশিরভাগ, হ্যাঁ বেশিরভাগ হয়েছে ইসরায়েলে!! আমি যখন

তালিকাটা দেখছিলাম তখন অনেকবার এমনও হয়েছে যে পরপর কয়েকবার ইসরায়েলের পতাকা দেখেছি। আমাদের ভাইয়েরা ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে সবসময় হামলা করে যাচ্ছেন। তবে আমরা কেন জানতে পারি না এসব? ইসরায়েলের ভিতরে এত অভিযানের কথা কেন আমরা মিডিয়ায় কখনো দেখি না? হতে পারে তারা এসব প্রচারে উৎসাহী নয়, কারণ এসব প্রকাশ পেলে তাদের ফাটা ইজ্জত আবার ফুটা হয়ে যাবে। হতে পারে এসব মিডিয়ায় কিছু কিছু আসে, আমরাই আলসেমিতে থাকার কারণে খেয়াল করি নি। . তবে যাই হোক। ইহুদিদের উপর কখনো হামলা করা হয় না এমন অভিযোগ পুরোপুরি অবান্তর তা আমরা নিজে জানার পর অন্যকে জানাতে পারি'।

ওই ভাইয়ের কথা এখানেই শেষ...!

এগুলো তো সবেমাত্র শুরু। আসল তো এখনো বাকী!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৫০৪

গুলশান-হত্যাকাণ্ড: মাসিক আলকাউসার পত্রিকা এবং কিছু কথা

Abu Amatillah Al-Hindi

Junior Member

০৮-১৬-২০১৬

আবারও আসলাম। কিছু কথার বিনিময় করবো বলে এসেছি। সাদামাটা কথা বলে যাবো। শারয়ি দলিল এখানে আনা হচ্ছে না, এর যোগ্যও নই এবং যখন কিনা আলোচ্য বিষয়গুলো শারয়ি নুসুসে প্রতিষ্ঠিত, তখন দলিলভিত্তিক আলোচনা এনে আনাড়ি কাজ করাটা অর্থহীন হবে বলেই বিশ্বাস করি, এই আলোচনার ভার আলিমদের কাছেই অর্পণ করলাম।

সম্প্রতি গুলশানে ঘটে যাওয়া is কর্তৃক হামলার ব্যাপারে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনার অবতারণা ঘটাচ্ছেন। বলে রাখা ভালো, is-র ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি নিয়ে আহলুস সুন্নাহর আলিমগণ সন্দেহগ্রস্ত নন। মিল্লাতু ইবরাহিমের দিকে আহ্বানকারী উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে সচেতনতা জারি রেখেছেন। কথা হলো গুলশান-হামলাকে কেন্দ্র করে একটি বিষয় ওঠে এসেছিলো- এই হামলার শারয়ি বাস্তবতা কতোটুকু? আর একজন মুসলিম কীভাবে এই হামলাকে মূল্যায়ন করবে? হারবি কাফিরদের রক্তের কোনো মূল্য নেই- এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমগণ ফোরামে আলোচনা করেছেন। মিল্লাতু ইব্*রাহিমের দিকে আহ্বানকারী ও এর প্রতিষ্ঠারত জিহাদি এক তানজিম হলো কায়িদাতুল জিহাদ। কায়িদাতুল জিহাদ এর মানহাজ সুস্পষ্ট করেছে।

এখন কথা হচ্ছে, যুদ্ধরত কাফিরদের রক্তপাত হালাল এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই রক্তপাত ওয়াজিব। মাসিক আলকাউসার এদেশের আহনাফ-দেওবন্দিদের কাছে জনপ্রিয় ইলমি পত্রিকা। মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া প্রতিষ্ঠানটি এদেশের দেওবন্দিদের ইলমি পতাকাবাহী এবং এই ভূমির জন্য বৈধ প্রতিনিধি। অন্যান্য বড় দেওবন্দি আলিম বিচ্ছিন্নভাবে যে আকিদাহ্ ও মানহাজের প্রচার করুক না কেন,

একে দেওবন্দিয়াতের প্রতিনিধিত্ব বলা চলে না, বা বলা যায় না। মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ও মাসিক আলকাউসার দেওবন্দিদের প্রতিনিধি হিশেবে ধরা যায়। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবকে দেওবন্দিয়াতের বৈধ প্রতিনিধি হিশেবে ধরা কর্তব্য। আর এই কর্তব্য আরও মজবুত হয় যখন এদেশের দেওবন্দিরা তাঁকে ইলমি বিষয়ে উপস্থাপন করে থাকেন। ফলে তাঁর ও তাঁর প্রতিষ্ঠান এবং পত্রিকাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। ওখান থেকে একটি কথা অনেক কাজকে পরিবর্তন করে দেয়ার সামর্থ্য রাখে। তাই, ওখান থেকে কোনো বিভ্রান্তি আসলেও বলা উচিত। এর আগেও আমার দেয়া প্রস্তাবনায় এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আমি কথা বলেছিলাম।

মূল কথায় আসা যাক, গুলশান-হামলা নিয়ে মাসিক আলকাউসারে **'প্রসঙ্গ : গুলশান-হত্যাকাণ্ড : "সর্বস্তরে দ্বীনী তালীমের বিস্তার ঘটানো সময়ের দাবি" : "কোনো অমুসলিমকে শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে হত্যা করা বৈধ নয়" : "জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা মুসলমানদের জানানো উচিত। এটি নিষিদ্ধ করলে সমস্যার সমাধান হবে না।"'** শিরোনামে একটি সাক্ষাৎকার ছেপেছে, মাসিক আলকাউসারের সম্পাদক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুদির মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ সাহেব এবং আলকাউসারের তত্ত্বাবধায়ক ও মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর আমিনুত তালিম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

এখানে দুজন উত্তর দেয়াতে কার্ উত্তর কোনটি বুঝতে সমস্যা হয়। যাইহোক, এই এলোমেলো সাক্ষাৎকার-আলোচনায় কটি বিষয় আমি তুল ধরছি-

১. কাফিরের রক্তের ব্যাপারে দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য প্রদান।

২. মানবরচিত বিধান ও শারিয়াহর মুখপাত্র শাসকগোষ্ঠীকে মুসলিমদের বৈধ কর্তৃপক্ষ হিশেবে মেনে নেয়া ।

৩. ইসলামি জিহাদের মুখপাত্রের ভূমিকা ।

৪. বাস্তবধর্মী প্রাজ্ঞ এবং দ্বীনের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ হিশেবে নিজেদের উপস্থাপন।

তাঁদেরকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত যে, তাঁরা আর যাইহোক, বর্তমানের অন্যান্য আলিমদের মতো একপেশে মূল্যায়ন

করছেন না, অথবা দেশপ্রেমভিত্তিক আলোচনা আনছেন না। তাঁরা যতটুকু পেরেছেন তাঁদের মতো করে ভারসাম্য এনেছেন।

১. কাফিরের রক্তের ব্যাপারে দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য প্রদান-

এক প্রশ্নের জবাবে কাফিরদের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি এ ব্যাপারটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। মূল সূত্র ধরে আলোচনা করেননি। ফলে আলোচনা কূটনৈতিক হয়ে যাবার সন্দেহ জাগতে পারে। মানুষ হত্যার অবৈধতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত এনেছেন। কিছু গতানুগতিক কথা বলেছেন। এক পর্যায়ে তিনি এইসব বিদেশিদের হত্যা করা নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। মুআহাদকে হত্যা সংক্রান্ত হাদিস এনে তিনি বলেন,**'মুআহাদ বলতে যে বা যাদের সাথে আহদ বা চুক্তি হয়েছে তাদেরকে বুঝায়। ফিকহী ভাষায় সে যিম্মি হোক বা সুলাহকারী মুআহাদ বা মুসতা'মান (আশ্রয় গ্রহণকারী)। যারা মুসলিম দেশে ভিসা নিয়ে অন্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে থাকছে তারা যে মুআহাদের অন্তর্ভুক্ত এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'**

একটু পরে তিনি আরও বলেন, **'সুতরাং শরীয়তে যেসব কারণে প্রাণদণ্ডের বিধান রয়েছে ঐসব কারণ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া ছাড়া কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। অমুসলিমের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো অমুসলিমকে শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে হত্যা করা বৈধ হয় না।'**

যাক, তাঁর এই ভিসাসংক্রান্ত কথানুযায়ী আমরা ধরে নিতে পারি, তিনিও জানেন ও মানেন- কাফিরের রক্ত কুফরের কারণেই হালাল। কিন্তু, বাস্তবে তাঁর একটি কথা এ ব্যাপারে সন্দেহ ও ধোঁয়াশা তৈরি করেছে- **'কোনো অমুসলিমকে শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে হত্যা করা বৈধ হয় না।'**এ একটি কথা আহদসংক্রান্ত আলোচনাটিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করেছে। আর আহলুল ইলমগণ এসব ব্যাপারের ফাঁকটুকু ঠিক ধরতে পারলেও, সাধারণ দেওবন্দি সমাজ বিভ্রান্ত হবে- এ সুনিশ্চিত। আর এসব হামলা ও হত্যার ব্যাপারটিতে অপ্রাসঙ্গিকভাবে শারয়ি দণ্ডবিধি রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করার আলোচনাটি আরও ধাঁধায় ফেলে দেয়, আসলে কী বুঝানো হচ্ছে!? এভাবেই এসব মাসায়ালায় মুজাহিদদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে এবং রোগাক্রান্ত লোকদের জন্য এগুলো দলিল হবে। সমস্যা আরও বাড়বে যখন তাঁদের এসব কথাকে ঢাল বানিয়ে একদল লোক নিজেদের

ফাতাওয়া ও ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচার ও প্রসার করতে নেমে যাবে। দ্ব্যর্থবোধক এই বক্তব্যের ফলাফল কারা বহন করবে- দেওবন্দি সমাজ, is নাকি কায়িদাতুল জিহাদ?! আর এর সুফল কে নেবে- তাওয়াগিত, মুরতাদ ও কুফরগোষ্ঠী নাকি দেওবন্দি সমাজ?!

২. মানবরচিত বিধান ও শারিয়াহর মুখপাত্র শাসকগোষ্ঠীকে মুসলিমদের বৈধ কর্তৃপক্ষ হিশেবে মেনে নেয়া-

তাঁদের কথাগুলোতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা এসব শাসকগোষ্ঠীকে মুসলিমদের বৈধ কর্তৃপক্ষ ভাবছেন। ভাবদৃষ্টে মনে হতে পারে- এটা যেন উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের মতো কোনো ইসলামি শাসনের যুগ, যেখানে শাসক হলো জালিম! মুরতাদ কর্তৃক প্রদেয় ভিসাকে শারয়ি চুক্তির আওতায় আনা এবং বিদেশিদের মুয়াহাদ বলা যে কতোটুকু আকিদাহর বিপর্যয়, তা ভেঙে বলা যাবে না। এই শাসকগুলো কর্তৃক আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবের শারিয়াহ্ দিয়ে শাসনের বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত, যদিও এটি তাওহিদের অন্যতম একটি দিক। এসব ব্যাপারে কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে করছি। এ ব্যবচ্ছেদ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হবে এবং সময়ের অপচয় ঘটবে, কারণ, মিল্লাতু ইবরাহিমের কোনো পথিক তাঁদেরকে নবির- সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- অনুসরণীয় ওয়ারিশ ভাবতে প্রস্তুত থাকার কথা নন। তবুও ইতিবাচক- উত্তরদাতা এক জায়গায় তাঁদের 'বৈধ' 'দায়িত্বশীল'দে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তাদের আরো বুঝতে হবে যে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের প্রিয় ধর্ম ইসলামের বিধান সমুন্নত রাখা এবং এর সঠিক চর্চা, বিস্তার ও প্রয়োগও তাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্বের বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।'

৩. ইসলামি জিহাদের মুখপাত্রের ভূমিকা –

এ বিষয়টি নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে, তবুও এ সময়ের অপচয়। গোটা আলোচনাতে তাঁরা এ কথা বুঝাতে চাইছেন যে– পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হলেও- তাঁরা জিহাদের ফিকহ ভালো জানেন এবং এর সঠিক প্রয়োগবিধিও তাঁদের নখদর্পণে। অথচ, মুসলিম উম্মাহর এই সংকট নিরসনে কোনো ইতিবাচক তত্ত্বও তাঁরা এ পর্যন্ত দিতে পারেননি। উপরন্তু, নির্যাতিত মুসলিমদের ব্যাপারগুলো এনে আবেগতাড়িত তরুণদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছেন। ভাবখানা এমন- তাঁরা

আবেগতাড়িত নন এবং জিহাদের বাস্তভিত্তিক প্রয়োগ কী, তা তাঁরা জানেন। অথচ উম্মাহ আজ পর্যন্তও তাঁদের জিহাদি ভূমিকার সুফল দেখতে পাচ্ছে না। আর গোটা জিহাদের ভার তাঁরা কাদের ওপর দিচ্ছেন? এই 'বৈধ' শাসকদের ওপর কিনা- তাও স্পষ্ট নয়। এসব শাসক প্রতিনিয়ত আল্লাহর আইনকে অবজ্ঞা করে, হারামের সয়লাবে গোটা দেশ ও জাতিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে এবং প্রিয়তম মুহাম্মাদের শাতিমকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়। মজার ব্যাপার হলো যারা জিহাদকে স্তব্ধ করতে চায়, জিহাদকে ফাসাদ মনে করে, একটা দ্বীনি বই রাখার ছুতোতে জিহাদি বই রাখার অপরাধে গ্রেফতার করে- তাদেরকে আবার বৈধ শাসক ভেবে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে! এইতো সেদিন, এ মুরতাদেরা এঁদেরই মাসলাকের আলিমদের রক্তে এই ভূমিকে সিক্ত করেছে। হ্যাঁ, এরা 'বৈধ' শাসক-ই বটে! আল্লাহ রহম করুন তাঁদের প্রতি! আমি সেসব ভাইদের কথাকেও সঠিক বলি না, যারা বলে থাকেন- জিহাদের আলিমদের কাছ থেকেই জিহাদের ইলম নিতে হবে। না, সুস্পষ্ট শারয়ি ইলম কখনও কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। তাহাজ্জুদগুজার নন এমন আলিম কি তাহাজ্জুদের হুকুম আহকাম নিয়ে কথা বলতে পারবেন না বা তাঁর কাছ থেকে এ সংক্রান্ত ফিকহ নেয়া যাবে না? না, এ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। হ্যাঁ, ময়দানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে ফাতাওয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু মৌলিক নীতিমালা বলেতো কথা আছে! থাক, কথা এ পর্যন্তই।

৪. বাস্তবধর্মী প্রাজ্ঞ এবং দ্বীনের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ হিশেবে নিজেদের উপস্থাপন- তাঁরা নিজেদের বাস্তবধর্মী প্রাজ্ঞ ও দ্বীনের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ হিশেবে নিজেদের উপস্থাপন করছেন, অন্তত আমার মনে হচ্ছে। তরুণদের আবেগের ব্যাপারটি এমনভাবে আনছেন যেন তাঁরাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক উপায়ের সঠিক প্রয়োগ-নীতি সম্পর্কে জানেন এবং চর্চাও করছেন, তাঁরা সুস্থ মাথায় এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আর সবশেষে দ্বীনের তালিম-তরবিয়তকেই আলোচনায় জোর দিচ্ছেন। দ্বীনের সার্বিক সমুন্নতি, জিহাদ, তাওহিদুল আমালি, তাশরি-হাকিমিয়াহ্ ইত্যাদি বিষয় অনুপস্থিত। উম্মাহর উত্তরণের দিকটি তাঁরা দিতেই পারছেন না। দিতে না পারা সমস্যা নয়, সমস্যা হলো- দিতে পারছেন বা দেয়ার প্রকৃত কর্তৃপক্ষ তাঁরাই, এমন পরোক্ষভাবে হলেও বুঝানো। হায়! তাঁরা যদি জানতেন, ভারসাম্যের অধিকারী এক আলিম আছেন, যিনি ভারসাম্যের মূর্ত প্রতীক, যিনি আবেগ ও প্রজ্ঞাকে সমন্বয় করতে সক্ষম, হায়, তাঁরা যদি শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম

আলমাকদিসির কথা জানতেন! তাঁরা যদি জানতেন, আজকের কায়িদাতুল জিহাদ কত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ভারসাম্যের নীতিতে পরিচালিত, এঁরা বোমার ভাষার চেও ইলম, শিক্ষা, বিশুদ্ধতার মানহাজ বেশি বুঝেন। এঁরা আধুনিক যুদ্ধ-কৌশল ও রাজনীতি এবং সিয়াসায় সবচে পারঙ্গম। এত প্রজ্ঞা ও বাস্তবতার নীতি নিয়ে মাদরাসার গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে বসে উম্মাহকে সংকট-নিরসনের সবক দিলেতো হবে না, এ তো দিনশেষে সবাই ভুলে যাবে, আর বাস্তবেও তাই, কেউ মনে রাখে না। মাদরাসার গণ্ডিতে থেকেই কিন্তু সবক দেয়ার কথা ছিলো। কেন, ইমাম হামুদ বিন উকলা আশশুয়াইবি কোন্ ময়দানের লোক ছিলেন? কোন্ ময়দানের লোক ছিলেন শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আলআলওয়ান?! ব্যাপার হলো তাওহিদ, ব্যাপার হলো মিল্লাতু ইবরাহিম, ব্যাপার হলো আল্ ওয়ালা ওয়াল্ বারা।

এতক্ষণ আলোচনা-সমালোচনা হলো। আলকাউসারের এমন ভূমিকায় কী সমস্যা তৈরি হতে পারে -

১/ সাধারণের ইমান এখন ইয়াকিনে রূপান্তর ঘটবে- না, এসব রক্তপাত যারা ঘটায় তারা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু।

২/ তাওয়াগিত এর কদর্যের আরও বৈধতা পাবে, আলকাউসারের এই সাক্ষাৎকারটি কিন্তু দরবারি আলিমদের মতো না, একটু কূটনৈতিক ধাঁচের- তাঁদের কাছে হিকমতও হতে পারে- ফলে এর ফলাফল তাওয়াগিত নেবে। মাঝখান থকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কায়িদাতুল জিহাদ এবং বেঁচে যাবেন দেওবন্দি কর্তৃপক্ষগণ।

কায়িদাতুল জিহাদের জন্য কিছু আবেদন-

১ আহলুস সুন্নাহর আলিমগণকে এবার মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের কাছে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা তুলতে হবে- সামনা-সামনি বা যেভাবেই হোক- নিরাপত্তাজনিত ব্যাপার কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়, এটি তানজিমের কৌশলের ওপর নির্ভরশীল।

২/ তাওহিদের জন্য এই জিহাদ চলবেই, কোথাও কোনো আলিম তা রুখতে পারেনি, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বন্ধ করতে হবে। এই কথাগুলো ধ্রুব সত্য। এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই। দিনশেষে তাওয়াগিত ভাঁড় আলিমদের আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে- এ নিয়ে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু, বাস্তবতা বুঝতে

হবেই, এমনিতেই সাধারণের সাথে কায়িদাতুল জিহাদের অনেক দূরত্ব, আরও তাওহিদ সম্পর্কে যদি এই হয় এই দেশের দ্বীনি দায়িত্বশীলদের অবস্থা, তাহলে সাধারণের অবস্থা কী হবে,ভাবা যায়? মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক কোনো ভাঁড় আলিম নন, কোনো দরবারি আলিম নন- আমার ধারণা মতে- তাই, এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে সঠিক মূল্যায়ন পাওয়া অমূলক নয়। তাঁর মাঝে ইনসাফ ওই ভারসাম্য আছে। এই দেশে দেওবন্দিদের শুদ্ধ মানহাজের ধারা এই আলকাউসার ও মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়াকেই ধরা যায়। ফলে এসব মাসায়ালাগুলো এই কর্তৃপক্ষের কাছে তুলতে হবে। তাঁদের কাছে পৌঁছুতে হবে। যদি সবচে বড় আলিমের সামনে দাঁড়ানোর মতো আলিম এই কায়িদাতুল জিহাদে না থাকে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তবে সামনের দিনগুলো আরও বেদনাদায়ক ও কঠিন হতে পারে, তাই প্রস্তুতি নেয়াটা কায়িদাতুল জিহাদের জন্য আগাম সুখবর হতে পারে। সময় থাকতেই সচেতনতা জরুরী ও কাম্য।

৩/ তাওয়াগিতের কাছে এ খবর পৌঁছানো যেতে পারে যে, মুআহাদ ছাড়া কাফিরদের রক্ত বৈধ বা হারবি কাফিরের রক্তপাত বৈধ- এমন বিষয় অমুক অমুক আলিম বা প্রতিষ্ঠানের লেখনী থেকে পাওয়া যাচ্ছে বা বুঝে আসছে, তাহলে তাওয়াগিত ও তাঁদের মুখোমুখি করা হবে। এতে তাওয়াগিতের সম্মানপ্রার্থী এসব ব্যক্তিত্ব তাওয়াগিতের আসল রূপ বুঝতে পারবেন বলে আশা করা যায়। এটি ব্যাপক আকারে করা যেতে পারে। সামাজিক সাইটে এ ব্যাপারে ভাইয়েরা বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৪/ ইলমের কর্তৃপক্ষের কাছে কায়িদাতুল জিহাদের মানহাজ ও এর প্রয়োগনীতি এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে হবে। দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে মাসায়ালায় ভুল বুঝা-বুঝির সৃষ্টি হয়। এসব কীভাবে পৌঁছানো যায়- এ চিন্তা দায়িত্বশীলগণ করবেন। কায়িদাতুল জিহাদ কেন, কী কারণে এসব হামলা এবং তাকফির হালাল ও ওয়াজিব মনে করে, তা জানাতে হবে। হয়তো তাঁদের ইনসাফের নীতি তাতে বজায় রবে।

মাসিক আলকাউসারের এই সাক্ষাৎকারটিতে অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এখানে তরুণদের আবেগকে একেবারেই ছোটো করা হয়নি, বরং এই হামলার

আবেগকে প্রশংসা করা হয়েছে, কৌশলে এতে তাওয়াগিতকে হুঁশিয়ার করাও হয়েছে। অন্যান্য আলিমদের মতো দেশ-প্রেমিক সুনাগরিক সাজার কসরত করা হয়নি। 'মগজ-ধোলাই' 'জঙ্গিবাদ' এসব স্থান পায়নি এতে। এ থেকে অন্যান্য দেওবন্দিসহ সব ধারার আলিমদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এখানে কাফিরদের ভালোবাসায় গদ-গদও করা হয়নি। ইনসাফের সাথে এ সাক্ষাৎকারটিকে মূল্যায়ন করতে হবে।

পরিশেষে কথা হলো- মাসিক আলকাউসার ও মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া মিল্লাতু ইবরাহিমের পথিকদের আশার স্থান নয়। কোনো আলিমকে নিয়ে এই ভাবনাও বাড়াবাড়ি- তিনি আমার মতো চিন্তা করবেন, আমার কথাগুলোই বলবেন। আলিম-উলামাদের সীমাবদ্ধতাও বুঝা উচিত। এটি মনে রাখতে হবে, সবাই ইমাম আহমাদ হন না, সবাই ইমামে আযম আবু হানিফা হতে পারে না, সবাই ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ হতে পারে না। এটি মনে রাখলে প্রত্যাশার চাপও কমবে, আশাহত হবার দুঃখও লাঘব হবে। আর আমাদের সামনেতো বর্তমানে ইমাম আবু হানিফা, আহমাদ, ইবনু তাইমিয়াহদের উদাহরণ আছেই। হ্যাঁ, হয়তো এ ভূমিতে আমাদের চোখ জুড়ায়নি, তাই বলে কি মহান রবের এই ভূমিতে কোনো হক আলিম নেই-ই, যিনি তাওহিদের পতাকা তুলে ধরেননি? আছে, ছিলো, আর থাকবেও, ইনশাআল্লাহ্। বাকি হলো, এই কাফেলাকে চিনে নেয়া, এই কাফেলাকে সঙ্গ দেয়া। অল্পরাই বড়ো কিছু করে, আর সবাই এর সুফল ভোগ করে। আমরা যেন অল্পদের মাঝেই হই এবং উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত হই।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪১২৭

প্রতিশোধকামী উম্মাহর প্রতি কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বার্তা

salahuddin aiubi

Senior Member

০৮-২৪-২০১৬

প্রতিশোধকামী উম্মাহর প্রতি কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বার্তা

প্রথম আসর

কে আছে, কুরআনের হেফাজত করবে?

শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর।

কে আছে, কুরআনের হেফাজত করবে?

হে সর্বাস্থানের মুসলিম ভাইগণ! আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

এই সিরিজ শুরু করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে সেই মহা আন্দোলন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাই, যাকে 'আরব বসন্ত' বলে ভূষিত করা হয়েছে, যা মিশর, তিউনিশিয়া ও ইয়ামানে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আর লিবিয়ায় তার পরিণতি কোন্ দিকে গড়ায় তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকে শামে এর মাধ্যমে বিজয়ের পথ সম্পর্কে অবগত হওয়া গেছে। বোঝার সহজের জন্য মিশরে কি কি ঘটেছে তার ইতবৃত্তি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। কারণ এতে অক্ষম ও পথচ্যুত মুসলিমদের ব্যর্থতার করুন চিত্র আর উদ্ধত ও অবাধ্য ক্রুসেডারদের শত্রুতার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠবে এবং মিশরের ঘটনাবলী থেকে যে ফলাফল আবিস্কার করা যাবে, তা অন্যান্য দেশেও বাস্তবায়িত করা যাবে।

মূলত: মিশরের কাহিনী ২৫ শে জানুয়ারী ২০১১ থেকে শুরু হয়নি। অনুরূপ আদবিয়া চত্বরের হত্যাযজ্ঞ, গণবিপ্লব ও সেনাবাহিনীর উত্থানের মাধ্যমে তা শেষও হয়ে যায়নি। কাহিনী এরও পূর্বের। এই কাহিনীর সূচনা হয়েছে ইমাম ও সংস্কারক শহীদ হাসানুল বান্না রহ: এর মাধ্যমে। এই মহান দায়ীই যুবকদেরকে বিনোদনকেন্দ্র, মদ্যশালা ও বিকৃত সূফিবাদের আসরসমূহ থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে একটি সুবিন্যস্ত বাহিনীর রূপ দান করেছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। কিন্তু এই সমস্ত অবদান সত্ত্বেও তিনি অনেক বড় বড় কিছু ভুলের মধ্যে পড়েছেন, যা অনেক ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করেছে এবং ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।

শায়খ হাসান আল-বান্না তার আন্দোলন শুরু করেছেন বাহ্যত: বাদশা ফুআদের সমর্থনের মাধ্যমে। যে একজন ভ্রষ্ট শাসক ছাড়া কিছুই ছিল না। যে ১৯২৩ সালের সংবিধানের আলোকে শাসন পরিচালনা করত, যেটা শুধু মিশরের ইতিহাসেই নয়; বরং আরবের সংবিধানসমূহের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। এছাড়া স্বয়ং ফুআদও ছিল মিশরে দখলদার ইংরেজদের একজন অনুগত সদস্য। তার মৃত্যুর পর তারই আদর্শ নিয়ে ক্ষমতায় আসে তার পুত্র ফারুক। যাকে হাসানুল বান্না রহ: অনেক বেশি সমর্থন করেন। যখন সে শাসন ক্ষমতায় বসে, তখন শায়খ হাসান আল-বান্না আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা:এর সুন্নাহর ভিত্তিতে তার কাছে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বায়আতের ঘোষণা দেন। অথচ ফারুক এই বায়আত গ্রহণ করেনি, যদিও ইখওয়ানের সমর্থনের কারণে আনন্দিত হয়েছে। কারণ সে হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের দ্বারা শাসনকারী একজন শাসক। একই সময়ে সে ইংরেজ কর্তৃত্বেরও অনুগত ছিল।

শায়খ হাসান আল-বান্না এই সংশয়কে শুধু প্রচার করেই ক্ষ্যান্ত হলেন না; বরং তাতে আপাদমস্তক ডুব দিলেন। তাকে আমিরুল মুমিনীন বলে ডাকলেন এবং যেকোন সময়, যেকোন স্থানে তার সমর্থনে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন ও তাকে 'কুরআনের হেফাজতকারী' বলে উপাধি দিলেন।

একারণে শায়খ হাসানুল বান্না রহ: এর কথায় ৪০ লাখ লোক ফারুকের হাতে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করে যে, তারা কুরআনের হেফাজতের জন্য তার সামনে মরতে রাজি এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীন হল তার একনিষ্ঠ সৈন্যবাহিনী। তাদের

পত্রিকা আরো দাবি করে যে, তারা তার জন্য নিজেদের আত্মাগুলোকে হাদিয়া হিসাবে পেশ করবে।

শায়খ হাসানুল বান্না ফারুককে মুসলমানদের খেলাফতের জন্য চেষ্টা করা ও ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব দান করার প্রতি উৎসাহিত করে। তাকে বায়আত দেওয়ার জন্য ইখওয়ানুল মুসলিমীনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করে। আর তার নিকট আবেদন করে, যেন সে এই মর্মে একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে যে, মুসলিম মিশরে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য ছাড়া কোন আইন করা হবে না। আর তখন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ১ লক্ষ্য যুবক তার জন্য সদাপ্রস্তুত সৈনিক হয়ে যাবে। অত:পর এ ব্যাপারে অপেক্ষার প্রহর অনেক দীর্ঘ হয়।

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে, যখন ফারুক ফিলিস্তীনে মিশরীয় সেনাবাহিনীর অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার দালালী নিয়ন্ত্রণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, যখন উক্ত সেনাবাহিনী আপাদমস্তক মাস্তি ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল, সে সময় শায়খ হাসানুল বান্না তাকে এই বলে সম্বোধন করেন:

"হে আমাদের অভিভাবক! আপনি আমাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালিত করুন। জাতি আপনার পশ্চাতে রয়েছে। আর আপনার চতুর্পার্শ্বে আল্লাহ সর্বোত্তম হেফাজতকারী ও সর্বশক্তিমান সাহায্যকারী।"

শায়খ ইমাম শুধু এই হঠকারিতাপূর্ণ ধোঁকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তিনি এর সাথে আরেকটি প্রতারণা যোগ করেন, যা ভয়াবহতায় তার চেয়ে কম নয়। তা হচ্ছে তিনি একটি অপরিপূর্ণ ও অস্পষ্ট কথার অবতারণা করেন। তিনি বলেন: সাংবিধানিক আইনের শাসন পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাংবিধানিক আইনের শাসন পৃথিবীর অন্য সকল শাসনব্যবস্থার তুলনায় ইসলামের অধিক নিকটবর্তী। ইখওয়ানুল মুসলিমীন অন্য কোন শাসনব্যবস্থাকে তার সমকক্ষ মনে করে না।

শায়খ শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরো কঠিন ভুলের মধ্যে লিপ্ত হন। তিনি ১৯২৩ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রশংসা করলেন। তিনি দাবি করেন: 'যে মৌলিক নীতিমালার উপর মিশরের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত তা ইসলামী মূলনীতিসমূহের বিরোধী নয়। তা ইসলামী শাসনব্যবস্থা থেকে দূরেও নয় এবং তার সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। মিশরের সংবিধান প্রণেতারা তা প্রণয়ন করার সময় এ

বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, যেন তার বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোন বর্ণনা ইসলামী মূলনীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।'

এটি একটি দু:সাহসিকতাপূর্ণ ভ্রান্তি, যা ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখে, এমন কারো নিকট এটা অস্পষ্ট নয়। স্বয়ং ইমাম শহীদ রহ:ই পরবর্তীতে তার ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন।

ইমাম হাসানুল বান্না রহ: শুধু এই চিন্তাগত ভুলের মধ্যেই ক্ষ্যান্ত থাকেননি। বরং তিনি এটা কার্যকর করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। ফলে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ষষ্ঠ অধিবেশন পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ তাদের ধারণামতে পার্লামেন্ট নির্বাচন উম্মাহর মিম্বার। যেখান থেকে যেকোন শুভ চিন্তার কথা শোনা হয় এবং প্রতিটি রুচিশীল দিকনির্দেশনা প্রকাশিত হয়। যেন তাদের ধারণামতে এটি উকায মেলা বা হায়দবারাক বা হাওয়ারীদের পরামর্শ সভার একট নতুন সংস্করণ, যাতে যেকোন আওয়াজকারী যা ইচ্ছা চিৎকার করবে, অত:পর তা কার্যকর করে ফেলবে।

এসকল ভ্রান্তিতে ডুবন্ত অবস্থায় শায়খ হাসানুল বান্না দুই দফা নির্বাচনে প্রার্থীতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমবার তাম্রমন্ত্রীর ইঙ্গিতে প্রার্থীতা থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন। দ্বিতীয়বার অনড় থাকতে চাইলে সরকার মিথ্যারোপ করে তাকে বসিয়ে দেয়।

তাই এখনও কি ইখওয়ানের জন্য বৃটেনের তথা গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ বোঝার সময় হয়নি? এখনও কি তারা নাটক বুঝতে পারেনি, না সর্বদাই না বোঝার উপর থাকবে?

তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। শায়খ হাসানুল বান্না বুঝতে পারেন, এ সব শুধুই তামাশা এবং শরীয়তের বিধানাবলীর বিরোধী। তাই শাহাদাত লাভের আট মাস পূর্বে তিনি 'কুরআনের যুদ্ধ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন, যাতে তিনি একথা স্বীকার করেন যে, মিশরের সংবিধানে ও আইনে যা আছে, তা কখনোই মিশরকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবে না, আল্লাহর বিধানের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কে নেই। বরং এগুলো আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ। তাই উম্মাহকে কুরআনের জন্য এই সকল শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে কুরআনের শাসন মানতে বাধ্য করা হবে।

অবশেষে শহীদ ইমামের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল সেই ব্যক্তির হাতে, যাকে তিনি কুরআনের রক্ষক বলে অভিহিত করেছিলেন। বাদশাহ ফারুকই ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাকে হত্যা করে।

তাই এখন কি হাসানুল বান্নার অনুসারীরা তার হত্যাকারী থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে? নাকি উস্তাদ হাদিয়ী রহ: এর মত লোকেরা তাকেই 'মহান বাদশা' বলে অভিহিত করেছে?

তারা ফারুকের কপটতার মাঝেই চলতে থাকল। অবশেষে ফারুককে বাদ দিয়ে জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে মিত্রতা করল। আব্দুন নাসেরের বিচারকদের মধ্যে একজন ছিল আনওয়ার সাদাত, যে উক্ত দলের স্বনামধন্য ফকীহ, আব্দুল কাদির আওদাহ রহ: ও তার সহপাঠিদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়।

তারপর আব্দুন নাসেরের মুত্যুর পর তারা আনওয়ার সাদাতের সাথে মিত্রতা করে। ফলে আনওয়ার সাদাত তাদেরকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা দেয়। অত:পর তার মৃত্যুর পর তারা কামাল সিনায়িরীর হত্যাকারী হোসনি মোবারকের সাথে মিত্রতা করে। তারপর তারা মুনাফেকীর মহরা দিতে থাকে। দ্বিতীয়বার হোসনি মোবারককে বায়আত দেওয়ার জন্য গণভবনে জনসমাবেশের আয়োজন করে। তারা তার সাথে থেকে মুজাহিদদের আক্রমণ ও যুব সম্প্রদায়ের ক্রোধে হাওয়া দেওয়ার জন্য যে মন্দ ব্যবসায় অংশ নেয়, তার মাধ্যমে তারা বড় ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে।

অত:পর একসময় তারা তার বৈরী হয়ে যায় এবং বারাদায়ীর পশ্চাতে আমেরিকান কৃপা দূতকে নির্বাচন করে। যখন বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন তারা ছিল সর্বপ্রথম চুক্তি আদান-প্রদানকারী। আকস্মিকভাবেই তারা সেনাবাহিনীর সাথে আতাঁত করে নেয়।

এখন দেখার বিষয় হল, তারা কি তাদের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সেই 'কুরআনী যুদ্ধে'অবতীর্ণ হয়েছে, যেটা তাদের শায়খ তাদেরকে আদেশ করে গেছেন? আফসোস তাদের জন্য! তারা তাদের শায়খের আদেশ সম্পর্কে অজ্ঞ সেঁজেছে। তারা বাস্তবতা ও শরীয়তের বিধানাবলীর ব্যাপারে একই ভুলের উপর অব্যাহত গতিতে চলছে।

তাদের শায়খ শহীদ রহ: বাস্তবতা বুঝতে ভুল করেছেন, ফলে ফারুককে কুরআনের রক্ষক এবং মিশরের সংবিধানকে ইসলামের অনুকূল সংবিধান বলে অভিহিত করেছেন। আর তার শীষ্যরা এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত হয়নি; বরং আরো গভীরে ঢুকেছে। তারা স্পষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতার ভাষা নিজেদের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছে, যা দেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে তারা একজন পরিপূর্ণ ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর মত ঘোষণা করেছে: তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন শরয়ী বিধান পাশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার তার পক্ষে ফায়সালা না দেয়। এছাড়া তারা ইসরাঈল ও আমেরিকার সাথে যেকোন সমঝোতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর ভিত্তিতেই তারা বিপ্লোত্তর নির্বাচনসমূহে অংশ গ্রহণ করে। যার ফলে মুহাম্মদ মুরসী প্রজতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করেন। ফলে তারা একই ভুলে আরেকবার পতিত হয়। আর তারা ধারণা করে, তারা সেই জিনিস বাস্তবায়ন করে ফেলেছে, যা তারা তাদের দীর্ঘ জীবনে স্বপ্ন দেখছিল। অথচ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাম্মদ মুরসী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছাড়া কিছুই না। এক্ষেত্রে তার মাঝে ও হোসনী মোবারকের মাঝে কোনই তারতম্য নেই, যার মত লোক রাষ্ট্রীয় সংবিধান, ইসরাঈলের সাথে সমঝোতা ও আত্মসমর্পণ এবং জাতিসংঘের নেতৃবৃন্দের সাথে অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিতে পারে। তার মাঝে ও হোসনি মোবারকের মাঝে পার্থক্য এটাই যে, তিনি গণতন্ত্রকে তার থেকে আরো কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। তিনি সকলকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যদিও এতে জিহাদী নীতির প্রতি তীর্যক ইঙ্গিত ছিল। সম্ভবত এটা তার ঐ সকল অপরাধগুলোর একটি, যার জন্য আমেরিকা ও তার দোসররা তাকে কখনো ক্ষমা করবে না। হোসনির পতনের পর থেকে মুরসীর কারাবন্দী হওয়া পর্যন্ত ইখওয়ান একবারও এই ভ্রষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে কোন একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি; ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তো দূরের কথা। ফলে পূর্বের অপরাধিরাই বিচার বিভাগ, সেনা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ও নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত থাকে। এরা তো শৃগাল ও চিতার আদর্শে বেড়ে উঠেছে। আর ইখওয়ান নিজেদেরকে প্রতিপালিত করেছে পোষ্য প্রাণীর খামারের ন্যায়, যাতে মুরগীর দল অধিক খাবার পেয়ে পরিপুষ্ট থাকে, কিন্তু আশপাশের চোর-গুণ্ডা ও বণ্য প্রাণীদের ব্যাপারে থাকে বেখবর। এই যখন ইখওয়ানের কাহিনী, তখন নব উঠন্ত তোষামোদকারী সালাফীদের

কাহিনী সংলাপ ও অর্থ অর্জন ছাড়া কি হবে? বরং ঐ সকল ব্যর্থ ও নমনীয় বিপ্লবীদের অবস্থাই বা কি হবে, যারা লাঞ্ছনাকর চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং পণ্ডিত মেরিটারের শীষ্যত্ব গ্রহণ করে?

তাই আমাদেরকে আমাদের পন্থা নিরীক্ষণ করে দেখতে হবে, ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করতে হবে; একই ভুল বার বার করা চলবে না। তাই মিশর, আরব বসন্তের দেশসমূহ, ইসলামী বিশ্ব ও সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমকে স্বীয় আকীদা ও নীতির ব্যাপারে সিংহের ন্যায় হতে হবে। কারণ যে সিংহের মত হবে না, তাকে চিতারা খেয়ে ফেলবে। আমাদের প্রজন্মকে সিংহশাবকের ন্যায় গড়ে তুলতে হবে; মেষশাবকের ন্যায় নয়। আমাদেরকে আমাদের যুদ্ধে নামতে হবে আল্লাহর কিতাব সামনে নিয়ে, যা সঠিক পথপ্রদর্শন করবে এবং তরবারী নিয়ে, যা তার সাহায্য করবে।

তাই বার্তা কি পৌঁছেছে?? হে লোক সকল! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক!!!

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সা: এর উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪২৫৮

হক্কের অতীত বর্তমান.....

Mohammad al bengali

Senior Member

০৯-১৮-২০১৬

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা ব্রিটিশ দখলদার ও কুফর শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধিতা ও জিহাদ করেছেন,তাই তারা হক্ক।

>>> আমরা "নাস্তিক ও কুফর সরকার" এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলি কিন্তু আমরা হক্ক !

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা ত্বগুতী শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করতে গিয়ে বালাকোটের ময়দানে হাজার হাজার শহীদের রক্তের নজরানা দিয়েছেন,তাই তারা হক্ক।

>>> আমরা ত্বগুতী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে রক্ত দেয়া দুঃসাহসী যুবকদের "ইয়ো ইয়ো"জেনারেশন বলে কটাক্ষ করছি কিন্তু আমরা হক্ক !

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা কুফর শাসিত ভারতবর্ষকে "দারুল হারব" ঘোষণা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, তাই তারা হক্ক।

>>> আমরা ধর্মনিরপেক্ষ কুফর শাসিত ভুখণ্ডকে "দারুল আমান" আখ্যা দিয়েছি কিন্তু আমরা হক্ক !

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা শাতিমুর রাসূল রাজপালকে হত্যাকারী ইলমুদ্দীন রাহঃ কে শহীদ আখ্যা দিয়ে তার এই অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ কর্মের জন্য গর্বের সাথে তাকে উম্মাহর বীর আখ্যা দিয়েছিলেন,তাই তারা হক্ক।

>>> শহীদ ইলমুদ্দীনের অনুসরণে বাংলার যমীনে শাতিমদেরকে উচিৎ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বীরত্বপূর্ণ কর্মকে আমরা সন্ত্রাস আখ্যা

দিয়েছি এবং সেইসব মহান যুবকদেরকে আমরা দ্বীনের ব্যাপারে অবুঝ ও আনাড়ি বালক আখ্যা দিয়েছি, তারপরও আমরা হক্ক।

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা কুফুরী আইনে পরিচালিত ব্রিটিশ শাসনের কাছে মাথানত করেননি।এজন্য হাজার হাজার আলিমের মাথা কেটে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের দু'পাশের গাছগুলোতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। তাদের ঈমানী দৃঢ়তার জন্য আমরা গর্ববোধ করি।কারণ তারা ছিলেন হক্ক।

>>> আমরা কুফুরী আইনে পরিচালিত ধর্মনিরপেক্ষ ত্বগুত সরকারের সাথে জঙ্গি নাম দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে এক দরবারীর ফাতাওয়ায় স্বাক্ষর করেছি এবং জঙ্গি নাম দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেছি,কিন্তু আমরা হক্ক। আসলে আমাদের হক্কের এই সার্টিফিকেট বড্ড মজবুত,শক্ত। এটি পানিতে ভিজিয়ে রাখলেও নষ্ট হয় না,আগুনে ফেলে দিলেও পোড়ে না। ফারদ্বুল 'আইন জিহাদ না করলেও এই সার্টিফিকেটে ডিগ্রী কমে না। জিহাদকে জঙ্গিবাদ নাম দিয়ে ত্বগুত সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে জিহাদের বিরোধিতা করলেও অক্ষয় এই সার্টিফিকেটের কোনো হেরফের হয় না। উম্মাহর শৌর্যবীর্য ও বিজয়ের একমাত্র মাধ্যম জিহাদের পতাকাকে 'আলমব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া এবং রক্তের নদী উৎসর্গ করা তানযীম ক্বা'য়িদাতুল জিহাদ তথা আল-ক্বা'য়েদা এবং এর সম্মানিত আমীরকে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি বললেও সেই হক্ক সার্টিফিকেটের ডিগ্রীতে কোনো পরিবর্তন আসে না।

এই সার্টিফিকেট কী পরকালে আমার কোনো উপকার করতে পারবে ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য করবেন। (মুসলিম)

হক্ক কে তা চিনার জন্য আমীরুল মুমিনীন আলী (কাররামাল্লহু ওয়াজহাহ) এর বর্ণিত আছারটি লাইটহাউজ হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ্*।

আলী রাঃ বলেন,

لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله،

অর্থাৎ তুমি ব্যক্তির মাধ্যমে হক্ককে চিনো না বরং হক্ককে চিনো,তাহলে হক্কের অনুসারীকে চিনতে পারবে।

আলহামদুলিল্লাহ্*, আমরা আমাদের সালফে সালেহীনের মাধ্যমে হক্ক চিনেছি। আর তার আলোকেই হক্কের পথিকদেরকেও চিনে নেবো ইনশাআল্লাহ্*।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৬৪২

জিহাদ কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল নয়

Umar Faruq

Senior Member

০৯-২৮-২০১৬

মানুষের মধ্যে একটি সমস্যা রয়েছে। আর তা হল, যখন কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা বলে যে, জিহাদ করে ঠিক কাজ করেছে এবং তারা যদি কোন যুদ্ধে পরাজিত হয় তবে বলে যে, তারা যুদ্ধ করে ভুল করেছে। এটি একটি গুরুতর সমস্যা। এ কারণে লেখক এই বিষয়টি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সাধারণ মানুষ ফলাফলের উপর ভিত্তিকরে জিহাদের বিষয়টি উপলব্ধি বা অনুধাবণ করতে চায়। যদি একদল মুজাহিদীন কোননির্দিষ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করে তখন মানুষ বলে যে, তারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি তারা কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে তারা ভুল পথে রয়েছে বলে মনে করে। এটি একটি ভুল উপলব্ধি। রাসুলুল্লাহﷺএকদল আম্বিয়াকে কেয়ামতের দিন দেখবেন যাদের কোন অনুসারী থাকবেনা। এটা মানে কি যে সেসবআম্বিয়াগণ ব্যর্থ? না, বরং তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, পূর্ণরূপে, কিন্তু কেউ তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি।যদি তাঁরা একজনকেও না পায়,তার সাথে ব্যর্থতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, হিদায়াত আল্লাহর হাতে এবং কোন আম্বিয়া বা অন্য কারও হাতে না। আমরা কি বলতে পারি, রাসুলুল্লাহﷺএর দাওয়াহ্ তাঁর নিজ চাচা আবু তালিবেরক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল? একটুও না। তিনি তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন এবং তাঁর থেকেও বেশি করেছেন। তাঁর চাচার অন্তর আল্লাহর হাতে ছিল, রাসুলুল্লাহﷺ-এর হাতে নয়। আমাদের ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা আছে। যেখানে মুসলিমরা কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয় এবং তাদেরকে বলা হতো যে, তারাআর কখনও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে জঘন্যতম যুদ্ধছিল আত-তাতারদের সাথে হিজরী ৬৬৬ সালে। যখন তাতাররা ইরাকের আশ শামে প্রবেশকরেছিল এবং ৪০ দিন অবস্থান করেছিল, তারা সেই ৪০ দিনে ১০ লক্ষ এর উপর মানুষকে হত্যা করেছিল। যা গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০জন হয়। তারা তখন আশ-শামের ভিতর অগ্রসর হতে থাকে এবং প্রতিটি যুদ্ধেমুসলিমদের পরাজিত করতে থাকে। মুসলিমরা সে সময় ভীষণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।তারা

অনুভব করছিল যে, তাতাররা একটি অপরাজেয় জাতি এবং তাদেরকে পরাজিত করা অসম্ভব। তাদের (তাতারদের) আর কিছু জায়গা দখল করতে বাকি ছিল, যাতে তারা পুরো মুসলিম সাম্রাজ্য দখল করতে পারত। কিন্তু কি ঘটেছিল? আল্লাহ্ মুসলিমদের এই পরীক্ষা দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তারা তাদের দো'আ এবং জিহাদের ক্ষেত্রে আন্তরিক হয়। তারা তখন তাতারদের 'আইন-জালুত' যুদ্ধে পরাজিত করে। এটি একটি সংকটময় পরাজয় ছিল এবং সেই সাথে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আবর্তন। যখন মুসলিমরা জয় লাভ করল, তারাতাদের শক্তির জন্য জয়লাভ করেনি। যেহেতু তারা তাদের অধিকাংশ শক্তি তাতারদেরকাছে হারিয়ে ছিল। সুতরাং কেউ যদি যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে তর্ক করে যে, মুসলিমদের প্রথমদিকে জয় লাভ করা উচিত ছিল, যেহেতু তাদের সৈন্যবাহিনী পরিপূর্ণ ছিল এবং তাদের প্রচুর সম্পদও ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে শেষ সময় যখন তারা জয় লাভ করেছিল, তাদের সৈন্যসংখ্যা কমে গিয়েছিল এবং সম্পদও সীমিত হয়ে পড়ে। কেউই কখনও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বা যুক্তির আঙ্গিকে জয় পরাজয় ব্যাখ্যা করতে পারেনা। মুসলিমরা তাদের সংখ্যা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে জয় লাভ করে না। তারা আল্লাহর ইচ্ছায় জয়লাভ করে। জয় আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। আমাদের প্রস্তুতিঃ আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে, অতঃপর লড়াই করতে হবে। যদি আমরা হেরে যাই, আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এবং আমাদের জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহ-তে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের যে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল তা পূর্ণরূপে পালন করেছি। এক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর উপর ফলাফল ছেড়ে দেই। যদিও প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ আজ যখন যুদ্ধের পদ্ধতিতে উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং সেই সাথে জটিলতর হয়েছে। কোন মুসলিম যদি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র ব্যাপারে অত্যন্ত প্রত্যয়ী হয়, তাহলে তার প্রস্তুতির জন্য সময় দেয়া প্রয়োজন। কোন মুসলিম যদি পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে পরাজিত হয়, তবে সে জন্য সে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবে। উপরন্তু কোন মুসলিম যদি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র জন্য একেবারেই প্রস্তুতি গ্রহণ না করে; তবে সে অনুরূপ কাজের কারণে বা অনুরূপ অবস্থায় পাপ অর্জন করছে,কারণ যখন জিহাদ ফারদ্ আল-আইন, তখন প্রস্তুতিও ফারদ্ আল আইন এবং জিহাদ যখন ফারদ্ আল কিফায়াহ, তখন প্রস্তুতিও ফারদ্ আল কিফায়া। সুতরাং জিহাদের প্রস্তুতির হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। যদি

আমরা বলি যে জিহাদ যুদ্ধের উপর নির্ভর করে ,তবেতা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং হতাশা বিস্তৃত হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবেই কাজ করবে। আমরা আমাদের সংখ্যা বা প্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ করছি না। এটা সম্ভব যে আমাদের সংখ্যা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের শত্রুদের থেকে বেশি এবং তবুও আমরা পরাজিত হয়েছি। কেন? কারণ আমরা জয়লাভের শর্তসমূহ পূর্ণ করিনি। আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে চান । তখন আমরা ইনশাআল্লাহ্ জিতব। আমরা জয়লাভের জন্য দায়বদ্ধ না। আল্লাহ্ আমাদের যে কাজের আদেশ দিয়েছেন, আমরা সেই কাজ পালন করি কিনা, আমরা সে ব্যাপারে দায়বদ্ধ। আমরা জিহাদের জন্য যুদ্ধ করি, কারণ তা আমাদের উপর ফারদ্। আমরা জয়লাভ বা পরাজয় বরণ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করি না, আমাদেরকে প্রস্তুতি এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ইবাদত পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমাদের অংশের দায়িত্ব পালন করতে হবে, অতঃপর আমাদের ক আল্লাহর কাছে দো'আ করতে হবে। ঠিক যেমনি করে 'বদরের' যুদ্ধের আগে রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যা করার তাই করেছিলেন, যেমন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা, মুসলিমদের যুদ্ধ করতে উৎসাহ প্রদান করা,পদমর্যাদা বিস্তৃত করা, সঠিক জায়গা নির্বাচন এবং আরও অনেক কিছু। যখন তা সব করা শেষ হল, তখন তিনি কি করলেন? তিনি একটি আলাদা নির্জনে চলে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে একটি দীর্ঘ দো'আ করলেন; যাতে আল্লাহ্ মুসলিমদের বিজয় দান করেন। উৎসঃ ছাওয়াবিত আলা-দারবিল জিহাদ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/newreply.php?p=২০৬৯১

বিশুদ্ধ মানহাজ পেইজ থেকে - . দ্বীন ইসলামের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আগে শিখবো।

umar mukhtar

Senior Member

১০-২৩-২০১৬

বিশুদ্ধ মানহাজ পেইজ থেকে –

দ্বীন ইসলামের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ আগে শিখবো। আগে মূলধন রক্ষা, পরে লাভ করার চেষ্টা - ইসলামের এই মূলনীতির আলোকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবোঃ

ক) কিছু কিছু মানুষ চির-জাহান্নামী হবে।

খ) কিছু কিছু মানুষ সাময়িক সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে।

গ) বাকীরা সরাসরি জান্নাতে যাবে। কেউ কেউ জান্নাতের উচ্চস্তরে যাবে, কেউবা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে।

তাই সবচেয়ে আগে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যাতে, আমরা চির-জাহান্নামী না হই, তারপর চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদেরকে বিন্দুমাত্র সময়ের জন্যও জাহান্নামে না যেতে হয়। তারপর চেষ্টা করতে হবে যাতে জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায়।

ক) চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে, আমাদেরকে মুসলমান হতে হবে আর মুসলমান অবস্থায় মরতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনঃ

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ এই সাক্ষ্য দেয়া যা ইসলামের প্রথম স্তম্ভ। অর্থাৎ আমি সকল প্রকার মিথ্যা ইলাহ (তাগুত), মিথ্যা মাবুদ, ইবাদাতের মিথ্যা দাবীদার, অনুসরণের মিথ্যা দাবীদার, অনুকরণের মিথ্যা দাবীদারকে অস্বীকার করে, পরিত্যাগ করে, সেসব মিথ্যা ইলাহদের সাথে শত্র“তা পোষন করে, তাদেরকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করছি।

আর আল্লাহর সকল নাম ও গুনাবলী, তাঁর কাজসমূহ, তাঁর ইবাদাত, তাঁর হুকুম-আহকামে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে অন্তরে, কথায় ও কাজে মেনে নিচ্ছি।

এখন লা ইলাহা অর্থ কি? কি এবং কারা সেই মিথ্যা ইলাহ - এটা না জানলে কি এসব মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করা যাবে?

এই মিথ্যা ইলাহদেরকে কিভাবে অস্বীকার করতে হবে? শুধু মুখের মাধ্যমে অস্বীকার করাই কি যথেষ্ট? সবগুলি মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করে, শুধুমাত্র যে কোন একটি মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার না করলে, পরিত্যাগ না করলে কি মুসলমান হওয়া যাবে?

এই ব্যাপারগুলি প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে।

আবার ইল্লাল্লাহ অর্থ কি? আল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়?

রব হিসেবে আল্লাহর কাজ, যেগুলিতে তিনি এক ও অদ্বিতীয় যেমনঃ সৃষ্টি করা, রিযিক দান, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আইন-প্রণয়ণ, বিচার-ফায়সালা, মৃত্যু দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে কিভাবে আল্লাহর একত্ববাদ বজায় রাখতে হয়?

বাস্তব জীবনে মানুষ কিভাবে আল্লাহর কাজ, তাঁর নাম ও গুনাবলীতে, তাঁর ইবাদাতে একত্ববাদ বিরোধী কাজ করছে বা শিরক করছে?

ইবাদাতের ক্ষেত্রে কিভাবে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মানতে হয়?

ইবাদাত' কাকে বলে? শুধু কি নামাজ-রোযা এগুলিই ইবাদাত? এই ব্যাপারগুলিও আমাদেরকে জানতে হবে।

মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ বলতে কি বুঝায়? রসুল কাকে বলে? রসুলের দায়িত্ব কি ছিলো?
তিনি কি কিছু জ্ঞান প্রকাশ্য জানিয়ে, বাকীটুকু গোপন রাখতে পারেন?

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে, বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো আইন-নিয়ম-শিক্ষা থেকে অন্য কোন মহাপুরুষ-বুদ্ধিজীবি-দার্শনিকের যেমনঃ এরিস্টেটল-প্লেটো-মাও-সেতুং- লেলিন-স্টেলিন-আব্রাহাম লিংকন কিংবা এ জাতীয় আরো অনেকের শিখানো আইন-নিয়ম-শিক্ষাকে উত্তম মনে করলে, সেগুলির প্রচার-প্রসার করলে, সেগুলি দিয়ে

নিজ দেশ-সমাজকে পরিচালিত করতে চাইলে কি নবীকে উত্তম আদর্শ মানা হয়? সে ক্ষেত্রে কি মুসলমান থাকা যায়?

ইবাদাতের ক্ষেত্রে নবীর সুন্নাতের বাইরে গিয়ে বিদয়াতে লিপ্ত হলে কিভাবে সেটা স্ববিরোধিতা হয়? এই ব্যাপারগুলিও আমাদেরকে জানতে হবে।

ইসলামের ২য় স্তম্ভ নামাজের যেভাবে কিছু পূর্বশর্ত আছে, যেগুলির যেকোন একটি পালন না করলেও নামাজ আদায় হয়না, যেমনঃ ওযু করা কিংবা শরীর পবিত্র থাকা; সেভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর কোন পূর্বশর্ত কি আছে? সেগুলি কি কি?

ঠিক যেভাবে কোন কোন কাজ করলে ওযু নষ্ট হয়, নামাজ নষ্ট হয়, পুনরায় নতুনভাবে ওযু করতে হয়, নামাজ আদায় করতে হয়; সেভাবে কি কি কাজ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়?

ঈমান নষ্টকারী কাজের মধ্যে বড় শিরক, বড় কুফর, বড় নিফাকী কি কি কাজে হয়?
কিভাবে আমাদের সমাজে মানুষ না জেনেই এসব কাজে জড়িত হচ্ছে?

এছাড়া রিদ্দা বা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ আমাদেরকে জানতে হবে যাতে আমরা ইসলাম গ্রহন করার পর আবার কাফির-মুরতাদে পরিণত না হই।

এরকম যেসব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমাদের মুসলমান থাকা কিংবা না থাকা – এসব জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক জ্ঞান। এই ব্যাপারগুলি আমাদেরকে সবচেয়ে আগে, সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে, সবচেয়ে বেশী সময় নিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত, আলেমদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়া উচিত।

এখন কোন আলেম সারা-জীবনে কখনো এসব মৌলিক ব্যাপারে আলোচনা না করে থাকলে, তাকে জিজ্ঞেস করা উচিৎ - কেন তিনি আমাদেরকে এসব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান থেকে এতদিন দূরে রেখেছেন?

আমাদেরকে এসব বিষয় না জানিয়ে আমাদেরকে বিপদ-সীমায় ফেলে রেখেছেন?

খ) সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকেঃ উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার পর আমাদেরকেঃ

(১) অন্যান্য সকল হারাম এবং কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমনঃ সুদ দেয়া নেয়া, সুদের লেখক হওয়া বা সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি।

এখন এ রকম কবিরা গুনাহগুলো কি কি? - তা আমাদেরকে জানতে হবে? বাস্তবে কিভাবে মানুষ এসব গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে? তা জানতে হবে। যেমনঃ সুদের ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক লোন নেয়া, লোন দেয়া, ফিক্সড ডিপোজিট রাখা, সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে চাকুরী করা ইত্যাদি ব্যাপার সমূহ।

(২) সকল ফরজ-ওয়াজিব সমূহ পালন করতে হবে। তাই কি কি কাজ একজন মুসলিমের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ আর কি কি কাজ সামষ্টিকভাবে ফরজ, তা জানতে হবে। যেমনঃ ইলম অর্জন, নামাজ প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, রোযা সাধনা, দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ-অসৎ কাজে নিষেধ, জিহাদ কিংবা পারিবারিক-সামাজিক যে সব দায়িত্ব আমাদের উপর ফরজ ইত্যাদি।

এই পর্যায়ে কোন কোন বিষয়ে ইলম অর্জন ফরজ? তা হলোঃ

فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه، كالطهارة، والصلاة، والصيام. ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة، وحج وجهاد. وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع)انظر رسالة ورثة الأنبياء،- شرح حديث أبي الدرداء للحافظ بن رجب، ضمن مجموع رسائله(

নিশ্চয়ই প্রত্যকে মুসলিমের উপর দ্বীনের ঐ সকল ব্যাপারে জ্ঞান-অর্জন ফরজ – যেগুলি তার প্রয়োজন। যেমনঃ পবিত্রতা, নামাজ, রোযা।

আর যার সম্পদ আছে তার জন্য ঐ জ্ঞান অর্জন ফরজ যা ঐ সম্পদের কারণে তার উপর দায়িত্ব বর্তায় যেমনঃ যাকাত, সদকা, হজ্জ এবং জিহাদ।

এ কারণে যারা বেচা-কেনা করেন, তাদের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ে হালাল-হারাম শিক্ষা করা ফরজ। ... (দেখুন মাজমুউর রাসাইল, পৃঃ ২২-২৩, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

এসব ক্ষেত্রে কতটুকু ইলম অর্জন ফরজ সে ব্যাপারে বিখ্যাত তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক রহমতুল্লাহি আলাইহিকে কতটুকু ইলম অর্জন ফরজ এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

'কোন ব্যক্তির সম্পদ না থাকলে তার উপর যাকাত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ফরজ নয়। অতঃপর তিনি বলেন, যখন তার একশত দিরহাম হবে তখন তার জন্য এর হিসাব রাখা ফরজ যাতে যাকাতের হিসাব করতে পারে। (দেখুন মাজমুউর রাসাইল, পৃঃ ২২-২৩, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

গ) জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যেতে হলেঃ

উপরে উল্লেখিত উভয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার পর - আমাদেরকে অন্যান্য নফল ইবাদাত সমূহ যেমনঃ কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, নফল রোযা, নফল নামাজসমূহ আদায়, দান-সদকা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক বেশী মনযোগী হতে হবে।

বাস্তবে দেখা যায়, আমরা সবাই "সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নামে না যাওয়া" এবং "জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার" জন্য প্রয়োজনীয় ইলম নিয়ে মহাব্যস্ত কিন্তু "চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া থেকে বাঁচার ইলম" নিয়ে কোন চিন্তা নেই।

পুরো ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমানদের নিছক অবহেলা আর কারো কারো ইমামতি হারানোর ভয়, কারো সত্য গোপন করা এবং আরো অনেকের দুনিয়ার সম্পদের লোভ - ছাড়া আর কিছু না!!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই ভালো জানেন।

https://www.facebook.com/PleaseGiveP...১৯৫১৯১৫০৮৫১৬:০

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫২১৬

জিহাদ বিকৃতির স্বরুপ... আশা করি জিহাদকে কীভাবে বিকৃত করা হচ্ছে তা বুঝার জন্য লেখাটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ্*

umar mukhtar

Senior Member

১০-২২-২০১৬

জিহাদ বিকৃতির স্বরুপ..... আশা করি জিহাদকে কীভাবে বিকৃত করা হচ্ছে তা বুঝার জন্য লেখাটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ্*।

খুব সহজে বুঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণের মাধ্যমে শুরু করছি। ধরুন,কোনো একজন ব্যক্তি কিংবা একটি দল বলছে যে, বলছে সলাত আদায় ফরয এবং আমরা যেভাবে সলাত আদায় করি,তার থেকে ভিন্ন একটি পদ্ধতিতে তারা সলাত আদায় করছে। যেমনঃ দুই রুকু ও এক সিজদাহর মাধ্যমে সলাত আদায় করছে কিংবা সলাতের পরিবর্তে যিকির করছে এবং এটিকেই সলাত বলছে। পাশাপাশি এটিও বলছে যে, বর্তমানে মানুষ যেভাবে সলাত আদায় করছে এগুলো সলাত নয়।

এখন এই ব্যক্তি কিংবা দলটির সলাত ফরয এই দাবী গ্রহণযোগ্য কি না ???? তারা কী পুরো সলাতের বিধানকেই পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিচ্ছে না ??? উপরের উদাহরণটি কোনো কাল্পনিক বিষয় নয় বরং পাকিস্তানে 'যিকরী' নামে একটি দলই রয়েছে,যারা আমাদের সলাতের পরিবর্তে শুধু যিকির করে এবং যিকরকেই সলাত বলছে। কিন্তু তারা কখনোই সলাতকে অস্বীকার করছে না। তাদের এই দাবী যে সম্পূর্ণ বাতিল এবং সলাতের বিকৃতি এটা বুঝার জন্য মনে হয় মুফতী কিংবা মুহাদ্দিস হওয়ার দরকার পড়ে না ।

এবার আসুন, আল্লাহ তা'আলা জিহাদ ফরয করেছেন। এই জিহাদ কীভাবে করতে হবে তার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ বছরব্যাপী দেখিয়ে গেছেন। লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে কিরাম পুরো জীবনব্যাপী এই জিহাদের 'আমল করে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট বক্তব্য

অনুসারে বিগত ১৪শ বছর ধরেই মুসলিম উম্মাহর আত-ত্বয়িফাতুল মানসূরাহ বা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাচ্ছেন,আলহামদুলিল্লাহ।

এখন যদি কেউ বলে বর্তমানে যা চলছে,তা জিহাদ নয় বরং সন্ত্রাস। আর উক্ত ব্যক্তি জিহাদ করছে না বরং নিজেদের মনগড়া কাজকে জিহাদ নাম দিয়েছে। উক্ত বাতিল কাজকে জিহাদ নাম দেয়া এবং 'আমভাবে বর্তমানে জিহাদ চলছে না এই কথার মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত সলাতের উদাহরণের ন্যায় জিহাদকে বিকৃত ও পরিবর্তন করা হচ্ছে। আশা করি এটি বুঝার জন্য বেগ পাওয়ার কথা না ইনশাআল্লাহ্*।

চরমোনাইয়ের সমর্থক কেউ হয়তো বলবে,তারাতো জিহাদকে অস্বীকার করেনি !!! আমি বলবো, ভাই, জামায়াতে ইসলাম কী কখনো জিহাদকে অস্বীকার করেছে ??? কখনো কী জীবনে তাদের কোনো নেতা বলেছে তারা জিহাদে বিশ্বাস করে না ??? কখনোই না।

কিন্তু তারা কী সেই জিহাদে বিশ্বাস করে,যা তালিবান ও আল-কায়েদা করছে ???? অবশ্যই না।

আরেকটু সামনে অগ্রসর হোন ! ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামীলীগ কিংবা বিএনপি কিংবা এধরণের কোনো কী কখনো বলেছে, আমরা ইসলামের জিহাদ নামক বিধানের বিরোধীতা করি ????

কারো কাছে এধরণের প্রমাণ থাকলে আমাকে প্রদান করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

আরো সামনে অগ্রসর হোন ! আফগানিস্তানে আমেরিকার পক্ষে তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামের নাম ব্যবহারকারী কিংবা সেক্যুলার মুরতাদ দলগুলো কী কখনো বলেছে,তারা জিহাদের বিরোধীতা করে !!!!!

অথবা সোমালিয়ায় আল-কায়েদার সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা আল-শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার কুফফারদের ভাড়াটে বাহিনী হিসেবে যুদ্ধ করা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামধারী সুফীবাদী মুরতাদ দলটি কী কখনো বলেছে যে, তারা জিহাদকে অস্বীকার করে !!!!

বরং আফগানিস্তানে এবং সোমালিয়ায় ইসলামের দুশমনদের গ্রাউন্ড ফোর্স হিসেবে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জিহাদ নাম দিয়েছে !! তারা নাকি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে !!!

তাদের কেউ মারা গেলে তাকে তারা শহীদ বলে আখ্যা দেয়। আপনি জানেন, আর না জানেন মুরতাদ আহমদ শাহ মাসুদকে আফগানিস্তানে তার কথিত ইসলামী দল সুস্পষ্টভাবে শহীদ আখ্যা দিয়ে তার শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করছে !!!

তারা কী কখনো একথা বলএছে যে, তারা ইসলামের জিহাদকে অস্বীকার করে !!!

বরং তারা জিহাদ করছে এই দাবীই করছে।

আপনি যদি আরো অগ্রসর হোন, তাহলে দেখতে পাবেন, সিরিয়ায় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শিয়া নুসাইরী(যাদেরকে অন্য শিয়ারাও কাফির বলে) আসাদ এবং তার সহচর হিযবুল লাত তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও তারা জিহাদ বলছে !!! তারা কখনো বলেনি যে,তারা জিহাদের বিরোধী।

এছাড়া দুনিয়াজুড়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোনো রাষ্ট্র কী কখনো বলেছে যে, তারা জিহাদকে অস্বীকার করে ???? কিংবা যারা কুরআনে বর্ণিত জিহাদ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ???? কখনোই না।

আপনাকে যদি আমি আরো সামনে নিয়ে যাই, তাহলে বলবো, গোটা দুনিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আমেরিকা কী কখনো বলেছে যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ??? কিংবা তারা কী কখনো এই কথা বলছে যে, তারা ইসলামের জিহাদ বিধানকে খারাপ মনে করে ???? বরং তারা বলছে, আমেরিকা ইসলামের পক্ষে কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। আমেরিকা(বুশ-ওবামা)র এই দাবী কী গ্রহণযোগ্য ???

উপরে যেসব দল এবং রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছি,তাদের অবস্থান এবং হুকুম ভিন্ন হতে পারে এবং ভিন্নই। কিন্তু জিহাদের বিকৃতির বিষয়টি বুঝার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন অবস্থা উপস্থাপন করলাম।

তাহলে কেনো এসব দল সরাসরি জিহাদের বিরোধিতা না করে যারা জিহাদ করে তাদের বিরোধিতা করে ???

কারণটা একেবারে সহজ ! কারণ,জিহাদ ইসলামের একটি অকাট্য বিধান। কুর'আনে একক বিষয় হিসেবে জিহাদের বিষয়ে সর্বাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। এটিকে অস্বীকার করলে ফোরকানিয়ার না-বালেগ শিশু ছাত্রটিও বুঝবে যে এটি একটি ভ্রান্ত দল বা মতবাদ,যারা জিহাদের বিরোধিতা করে কিংবা জিহাদকে অস্বীকার করে। আর তাই যখনই জিহাদের বিরোধিতা করা হয়েছে,তা সরাসরি জিহাদের বিরোধিতা করা হয়নি বরং মুজাহিদদের কাজকে সন্ত্রাস নাম দিয়ে কৌশলে জিহাদের বিরোধিতা করা হয়েছে।

.....আরেকটি বিষয়,যা উপরের বিষয়টি থেকেও খতরনাক বা মারাত্মক। সেটি হচ্ছে, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত কাজকে জিহাদ আখ্যা দেওয়া। এটি কতটা ভয়াবহ তা আমি ভাষায় বুঝাতে অপারগ,মা'আযাল্লাহ।

আমরা যখন আগে জামায়াতে ইসলামের নেতাদেরকে অতঃপর চরমোনাইয়ের (সাবেক নাম) ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতাদের জিজ্ঞেস করতাম, জিহাদ করাতো ফরয ! আপনারা কেনো জিহাদ করছেন না ?? গণতন্ত্রতো কুফুরী এবং হারাম,তাহলে ইসলাম কায়েমের জন্য আপনারা কেনো এই কুফুরী পন্থা অবলম্বন করছেন ???

তাদের অসংখ্য নেতাদের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি, গণতন্ত্র যদিও কুফুরী তথাপিও আমরা বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করেছি। যেমনটা বাধ্য হলে শুকরের গোশত খাওয়াও জায়েয হয় !!!

এখন কিন্তু তারা এই উদাহরণ দেয় না। কারণ এখন তারা গণতন্ত্রকে হালাল এমনকি ইসলামী আন্দোলন/জিহাদ বানিয়ে ফেলেছে !!! লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি, জীবন রক্ষার জন্য নিরুপায় হয়ে শুকরের গোশত ভক্ষণের মাধ্যমে কী সেই শুকরের গোশত গরুর গোশত হয়ে গেছে ??? নাকি তা শুকরের গোশতই রয়ে গেছে ??? শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর তাগিদে ঐ সময়টুকুর জন্য তা জায়েয কিছুতেই তা গরুর গোশত হয়ে যায়নি।

পক্ষান্তরে আজ আমরা কী দেখছি !! (তাদের দাবী অনুযায়ী) নিরুপায় হয়ে হিকমত হিসেবে শুকরের গোশত ভক্ষণ করার ন্যায় গ্রহণ করা গণতন্ত্রকে তারা

আজ শুধু গরুর গোশতের মতো বৈধই বলছে না বরং ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া ও ফরয ইবাদত 'জিহাদ' নাম দিয়েছে !!! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। আর কতো বিকৃতির পর আমরা অনুধাবন করতে পারবো !!!!

যদিও গণতন্ত্রকে বুঝানোর জন্য শুকরের গোশত দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু বাস্তবে শুকরের গোশতের চেয়ে গণতন্ত্র বহুগুণে মারাত্মক। কেননা শুকরের গোশত হচ্ছে হারাম, আর গণতন্ত্র হচ্ছে কুফুরী মতবাদ।

বিষয়টির ভয়াবহতা চিন্তা করলে আমি বিমূঢ় হয়ে যাই !!!

তাই সকলের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করবো,দ্বীনের সবধরণের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে উম্মাহর হক্ব জামা'আত আত-ত্বয়িফাতুল মানসূরাহ তথা সর্বদা জিহাদ করা দলটির সাথে আমরা যুক্ত থাকি । উম্মাহর এই হক্ব জামা'আতের বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের আলোকে 'আল_ওয়ালা ওয়াল বারা' নির্ভর জীবন গড়ে তুলি,তাহলে জিহাদসহ দ্বীনের অন্য যেকোনো বিকৃতি থেকে রক্ষা পাবো। উম্মাহর এই হক্ব জামা'আতের সাথে যুক্ত থাকলেই পরিশেষে ঈসা আঃ এর সঙ্গী হয়ে দাজ্জাল ও দাজ্জালের বাহিনীর ঈমান বিনষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবো ইনশাআল্লাহ্*। কারণ হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে সর্বদা জিহাদ করা সেই জামা'আতটিই দাজ্জালের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করবে।

হযরত ইমরান বিন হুসাঈন রাদ্বিঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ক্বিতাল করতে থাকবে এবং তাদের বিরোধীদের উপর জয়ী/প্রভাব বিস্তারকারী থাকবে। এমনকি তাদেরই সর্বশেষ দল মাসীহে দাজ্জালের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৪৭৬, এছাড়াও হাদীসটি মিশকাত শরীফ,কিতাবুল জিহাদের ২য় পরিচ্ছেদের ১ম হাদীস।)

আল্লাহ আমাদেরকে সকল দল,মত এবং বিকৃতি পরিহার করে আত-ত্বয়িফাতুল মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাউফীক্ব দান করুন।

বিঃদ্রঃ এই লেখার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের দাবীদার দলগুলোকে তাকফীর করা বুঝলে তার জন্য অগ্রীম করুণা রইলো।

https://www.facebook.com/permalink.p...০০০১১২০৪৮৬৮৩৩৪

পোস্ট লিংক https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫২১২

জঙ্গিবাদের অভিযোগ থেকে কখন আপনি মুক্ত হবেন?-

উস্তাদ আহমাদ নাবিল হাফিজাহুল্লাহ

umar mukhtar

Senior Member

১০-২৯-২০১৬

তাগুতের হাতে গ্রেফতারের পূর্বে এক শহীদ আরব মুজাহিদের লেখা শেষ প্রবন্ধ অনুকরণে-
(মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারলে বোঝার আছে অনেক কিছু, চিন্তাশীল সকল ভাইকে সম্পূর্ণটা পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি)

এক
কেন আমি ওয়ান্টেড পার্সন?

চার দিক থেকে জবাব আসতে লাগলঃ সন্ত্রাস..... সন্ত্রাস ..... (জঙ্গিবাদ)। তুমি সন্ত্রাসী (জঙ্গি)। আর সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সন্ত্রাসকে দমন করা, জঙ্গিবাদের নির্মূল করা।

ঠিক আছে .....।

সন্ত্রাসের এই অপরাধ থেকে আমি মুক্ত হতে চাই, যার ফলে আমি আজ মোস্ট ওয়ান্টেড, আমাকে বন্দি ও হত্যা করা সরকারের দায়িত্ব। বলুন, কি সেই সন্ত্রাসটি?
উত্তরঃ মানুষ হত্যা .....।

কিন্তু ....., সৌদি সরকারও তো মানুষ হত্যা করে .....।

তারা শায়েখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী, বীর মুজাহিদ দান্দানী সহ অন্যান্য আলেম ও মুজাহিদীনদেরকে হত্যা করেছে। তাহলে সৌদি সরকারও সন্ত্রাসী সুতরাং আমরা যখন উভয়েই সন্ত্রাসী আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে সামনে বাড়া,তাহলে আমি তাদের কাছে ওয়ান্টেড হলাম কেন? নাকি সৌদি সরকার আমার থেকে ভিন্ন?

কেননা সৌদি সরকার যাদেরকে হত্যা করেছে তারা সন্ত্রাসী? ভাল কথা ...।

আমিও তো সন্ত্রাসীদেরকেই হত্যা করেছি।আমেরিকানরা কি সন্ত্রাসী নয়? ইরাক, আফগানস্থান ফিলিস্তিন সহ অন্যান্য ভূখণ্ডে অ্যামেরিকা যে সন্ত্রাস করেছে, এর চেয়ে বড় কোন সন্ত্রাস হতে পারে?!! আমিও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করলাম, সৌদি সরকারও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করল!!

তাহলে আমি কেন সন্ত্রাসী হব? অথচ আমরা উভয় একই কাজ করছি, সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করছি?!! বরং সৌদি সরকারই এমন অনেককে হত্যা করছে যারা সন্ত্রাসী নয় .....।

তারা মার্কিন বাহিনীকে সহায়তার মাধ্যমে ইরাকের সধারন জনগণকে হত্যা করেনি?!!
নাকি সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী হিসাবে কাল তালিকাভুক্ত করেছে এ কারণে,আমি ঐ সৈনিকদেরকে হত্যা করেছি যারা অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে পাহারা ও নিরাপত্তা দিত?!! তাহলে সৌদি সরকার কি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেনি,
যারা সন্ত্রসীদেরকে পাহারা দিত?!! যেমনটি করেছে তারা কাসীমের মধ্যে। অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদের পাহারাদার আর অন্যান্য সন্ত্রাসীদের পাহারাদারদের মাঝে,
কি এমন পার্থক্য বিদ্যমান?!!!

দুই
মনে হয়, এখন আমি বুঝতে পেরেছি .....।

সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড ঘোষণা দিয়েছে কারণ আমি সন্ত্রাসীদের বন্ধু, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল,আর নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসীর বন্ধুও সন্ত্রাসী।

কিন্তু সৌদি সরকার ঘোষণা দেয়নি কি, অ্যামেরিকা তাদের বন্ধু?!!

পৃথিবীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী কি অ্যামেরিকা নয়?!!

সৌদি ও অ্যামেরিকার মধ্যকার প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা গভীর সম্পর্কের ব্যাপারটা কি নিশ্চিত করেনি?!!

অনুগ্রহ করে আমাকে জবাব দাওঃ

কেন আমি ওয়ান্টেড হলাম?!!!

আমি যেমন সন্ত্রাসী সৌদি সরকারও কি একই রকম সন্ত্রাসী নয়?!!

তাহলে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে তাদের ভ্রাতাকে কীভাবে তারা তাড়া করে?

আমি হত্যা করেছি অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদের পাহারাদারদেরকে,

সৌদি হুকুমত হত্যা করছে শরয়ী ইসলামী 'সন্ত্রাসীদের" আশ্রয় দাতাদেরকে।

আমি যেমন সন্ত্রাসীদেরকে ভালবাসি তাদের প্রতি সহানভুতি প্রকাশ করি, সৌদি সরকার মার্কিন সন্ত্রাসীদেরকে ভালবাসে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। বরং তারা এই বন্ধুত্ব নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে থাকে।

তিন

হতে পারে-আমি ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী, কারণ আমি মুসলিমদের দেশে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি।

কিন্তু .....।

ইরাক মুসলিমদের দেশ, অ্যামেরিকা ইরাকে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। জঙ্গি বিমান থেকে মিসাইলের আঘাতে পুরো দেশকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। অথচ সৌদি, অ্যামেরিকাকে ওয়ান্টেড হিসাবে আখ্যায়িত করে না। এমনকি শত্রু পর্যন্ত ভাবে না বরং তাদেরকে সাহায্য করে।

সৌদি সরকারের কাছে কোন প্রমাণ আছে, যে আমি সন্ত্রাসীদেরকে কোন সাহায্য করেছি? যদি থাকে তাহলে ভাল কথা, একই ভাবে সৌদি সরাকারও অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে, সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

আমি কি তাদের আশ্রয় দিয়েছি?

সৌদি সরকার মার্কিন বাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছে।

আমি কি তাদের অস্ত্রের হেফাজত করেছি?

সৌদি সরকার সৌদিকে অ্যামেরিকার অস্ত্রগুদাম বানিয়েছে।

তারা কি আমার কাছ থেকে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে?

মার্কিন বিমানগুলো সৌদি থেকে ইরাকে যেয়ে তাদের সন্ত্রাস পরিচালনা করছে।

আমি কি তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করছি?

অথচ ইরাক-আফগানের যুদ্ধে সৌদি হচ্ছে,

অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্যকারী অন্যতম একটি রাষ্ট্র।

ওহে সৌদি শাসকগুষ্ঠি! তোমরা লক্ষ্য কর, আমরা আর তোমরা উভয়েই সন্ত্রাসের অংশীদার! হ্যাঁ তবে যদি আমি তোমাদের থেকে আগে বেড়ে থাকি আলহামদুলিল্লাহ্! কেননা আমি মুসলিম।

চার

হ্যাঁ এখন আমার বুঝে এসেছে.....!

আমি সন্ত্রাসী, কেননা আমি সৌদি শাসকদেরকে তাকফীর করেছি।

কিন্তু .....!

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তো সৌদি সরকারও সাদ্দামকে তাকফীর করেছিল?!!

সৌদি সরকার সাদ্দামকে কেন তাকফীর করল?

এই কারণে তাকফীর করেছে, সে আল্লাহ্ তায়ালার বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধানে শাসন পরিচালনা করে? সৌদি সরকারও তো আল্লাহ্ তায়ালার বিধান ব্যতিরেকে ভিন্ন বিধানে শাসন পরিচালনা করে থাকে।

আর আমি তো তাকফীরে এই ফাতওয়া পেয়েছি সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে-শাইয়েখ রহঃ এর ফাতওয়া থেকে, যার ফলে এই ফাতওয়া সৌদি সরকার বাজারে নিষিদ্ধ করেছে। শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হামীদ সহ অন্যান্য শায়েখদের থেকেও একই ফাতওয়া বিদ্যমান আছে।

আর আমি দেখছি বিলাদুল হারামাইনের অধিকাংশ বিষয়ে, মানব রচিত আইন দ্বারা ফায়সালা করা হয়।

তাহলে কেন তারা সাদ্দামকে তাকফীর করল?

উত্তরঃ এ কারণে, সে একজন বাথিস্ট?

বাথিস্ট কি? এই শব্দে তো ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহের মধ্যে কোন কারণ বিদ্যমান নেই। তারা কি এ কারণেই কুফর মনে করে না যে, বাথিস্টদের কাছে সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বর মাপকাঠি হচ্ছে দ্বীনের পরিবর্তে জাতীয়তা। ?

সৌদির কাছেও তো সম্পর্ক ও বন্ধুত্বয়ের মাপকাঠি,দ্বীনের পরিবর্তে দেশ ও আরব জাতীয়তার উপর।

বাথিস্টরা কি এ জন্য কাফের, কেননা তাদের কাছে একজন আজমি মুসলিমের চেয়ে আরবি কাফের শ্রেষ্ঠ?

আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সৌদি শাসকদের কাছে একজন আরবি কাফের একজন বাংলাদেশী মুসলিমের চেয়ে উত্তম।

হ্যাঁ যদি আমি এ কারণেই সন্ত্রাসী হই যে, আমি সৌদি সরকারকে কাফের মনে করি। তাহলে সৌদি সরকারও এ জন্য সন্ত্রাসী যে, তারা সাদ্দাম হুসাইন কে কাফের মনে করে। বরং সৌদি সরকার এ ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে------

১১ সেপ্টেম্বরের মোবারক আক্রমণ পরিচালনাকারী বীরদেরকে সুলতান বিন আব্দুল আযীয তাকফীর করেছে, সে বলেছে তারা নাকি ইসলামী মিল্লাত থেকে খারেয হয়ে গেছে। তাহলে যে ভাবে আমি ওয়ান্টেড একই ভাবে সুলতান বিন আব্দুল আযীযও যেন ওয়ান্টেড হয়।

রিয়াদের মধ্যে মার্কিন ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ পরিচালনাকারীদেরকে আব্দুল্লাহ তাকফীর করেছে। সুতরাং আমার মত যেন আবদুল্লাহ ওয়ান্টেড হিসাবে গণ্য হয়।

ওরে সন্ত্রাসীর দল!!!

আমাকে ঐ সন্ত্রাস বোঝাও! যেটার কারণে আমাকে তোমরা ওয়ান্টেড আখ্যায়িত করছ।?!!! আমি যা করেছি তা কি অ্যামেরিকা করেনি?!!

বরং এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী করেছে।

তাহলে তারা কেন সন্ত্রাসী (জঙ্গি) হচ্ছে না।?!!!

কেন অ্যামেরিকার প্রতি সহানভুতি প্রকাশ অপরাধ বলে বিবেচিত হচ্ছে না?!

যেভাবে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে?!!!

আমাকে কি তোমরা নাসারা (খ্রিস্টান) হতে বলছ?

কুফরী করতে বলছ? তাহলে অ্যামেরিকার মত আমি এই সন্ত্রাসের অপরাধ থেকে মুক্তি পাব?!!

এটাই কি সৌদি সরকার আমার থেকে আশা করে?!

ইহুদী-নাসারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ কর।

সৌদি সরকার সন্ত্রাস করেছে।

সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখিয়েছে।

সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্য করেছে।

তাদেরকে মাল দিয়ে শক্তিশালী করেছে।

মার্কিন সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে সব করেছে।

তথাপি কেন তারা জঙ্গি-সন্ত্রাসী হবে না?!!

এই কারণে কি, তারা হচ্ছে একটা হুকমত বা সরকার?!!

তাহলে আমার উপরও তো আবশ্যক হচ্ছে,

যে কোন ভাবে ক্ষমতা দখল করা।

যাতে আমিও এই সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাই।

পাঁচ

আচ্ছা ঠিক আছে .....।।

যা আলোচনা হল সব বাদ!!!

যদিও আমি কোন অভিযোগ ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত, যে সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড আখ্যায়িত করেছে, যদিও সে আমার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধে অপরাধী, তথাপি আমি নিজেকে সমর্পণ করব .....।!

তবে আমি কিছু শর্ত দেব ----------।

আমি এমন শর্ত দেব না, যার হক শরীয়ত আমাকে দেয়নি।

আমর প্রথম শর্ত হবে,

আমার ফায়সালা করতে হবে শরয়ী মাহকামাতে,

ইনসাফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য মাহকামা।

আমার আর একটি শর্ত হচ্ছে, আমাকে নির্যাতন করা যাবে না।

আমার শেষ শর্ত হচ্ছে, আমার যে সমস্ত আপনজনকে সরকার জিম্মি হিসাবে আটক করেছে, তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে।

হ্যাঁ এগুলোই আমার শর্ত।

কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, সৌদি সরকার আমাকে জেলে ভরবে, আমার সকল শর্ত অস্বীকার করবে।

তাহলে আমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে,সরকারকে এই শর্ত পুরনে বাধ্য করতে অথচ আমি জিন্দানখানায় শিকলাবদ্ধ।

একটা সমাধান পেয়েছি --------।

আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এর সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোন শায়খের কাছে যাব।

তিনি হতে পারেন, সাফার আল- হাওালী।

আমি তার কাছে আমার শর্তগুলো পেশ করব,তাকে এ ব্যাপারে সরকারের সাথে আলোচনা করতে বলব।

তিনি যে এটা করতে সক্ষম হবেন, আমি এই নিশ্চয়তা পাব কীভাবে?

হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে যে,সরকার শর্ত মানলে তাকে এ ব্যাপারে মিডিয়ার মধ্যে

প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে হবে।

কিন্তু.....!
এই একই কাজ কি ফাকআসী করেননি?

ফাকআসীর শর্তগুলো হেওালি কি সৌদি পত্রিকার সমূহের মধ্যে প্রকাশ করেননি?

তথাপি ফাকআসী তার হক সমূহের নিশ্চয়তা পেয়েছে কি?!!

না পায়নি!!!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি নায়েফ দৃশ্যপটে এলো, এসে হেওালিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল।

ফাকআসীর শর্ত সমূহ অস্বীকার করল।

নায়েফের দাবি অনুযায়ী হেওালি মিথ্যা বলেছিল কি?

না এটাই স্বাভাবিক যে নায়েফ হেওালিকে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছে?

তাহলে দুর্বল কারাবন্দী ফাকআসীর ক্ষেত্রে কি অবস্থা হয়েছে?!!

আর কে আছে এমন, যে ফাকআসীর শর্তের নিশ্চয়তা দেবে, তার জামিন নেবে?

আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা থেকে সরে এসেছি,

কারণ আমি যে সতর্কতাই নিতে চাই, ফাকআসী তাই গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

তাই মৃত্যুই আমার কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয় .....।

ছয়
যদিও আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা বাদ দিয়েছি,

কিন্তু সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার দিঢ় সংকল্প থেকে পিছে সরে আসতে পারিনি।
সন্ত্রাসের সকল উপকরণ দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে অ্যামেরিকা।

তাদেরকে সন্ত্রাসের সকল সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়।

অথচ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো অ্যামেরিকার ভালবাসা অর্জনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আমাকে অপরাধী সাব্যস্তকারী সৌদি সরকার এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগামী।

অ্যামেরিকার সাথে বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও ভালবাসা তাদের জন্য গর্বের ব্যাপার কেন?

অথচ আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ অপরাধ!!!

যে রাষ্ট্র মার্কিন সন্ত্রসিদেরকে সাহায্য করে,

তার সাথে সম্পর্ক রাখা জনগণের উপর ওয়াজিব কেন?!!

আর শরয়ী জঙ্গিদের (সন্ত্রাসীদের) ব্যাপারে সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ

জনগণের জন্য হারাম কেন?!!

সন্ত্রাসী সৌদি সরকারকে সাহায্য করা,

কেন জনগণের উপর আবশ্যক?

আর আমাদেরকে সাহায্য করা হারাম?!!

আমি কারণ খুঁজে পেয়েছি .....

হ্যাঁ... হ্যাঁ... আমি এখন কারণ বুঝতে পেরেছি .....।

আমি উসামা রহঃ এর আওয়াজ শুনতে পেলাম ----------

إنَّ الناس يميلون مع القوي .. إرهابُنا جريمة .. وإرهاب أمريكا أمر مشروع .. أبرياؤهم أبرياء .. و أبرياؤنا ليسوا أبرياء ..

মানুষেরা ঝোঁকে শক্তিশালীর দিকে ...।।

আমাদের "সন্ত্রাস" হচ্ছে অপরাধ

আর অ্যামেরিকার সন্ত্রাস হচ্ছে বৈধ।

তাদের নিরাপরাধ জনসাধারণ নিরাপরাধ

আর আমাদের নিরাপরাধ জনসাধারণ অপরাধী।!!

আল্লাহ্ তায়ালা আপনার প্রতি রহম করুন, হে উসামা!

এখন বুঝেছি কবিতার পংতি।

এখন চিনেছি ঘোড়ার লাগাম।

এখন পেয়েছি সমস্যার সমাধান!

হ্যাঁ এখন বুঝেছি.....।।

আমাকে শক্তিশালী হতে হবে।

যখন তুমি শক্তিশালী হবে,

তখন তুমি যাই কর সন্ত্রাসী হবে না।

ঠিক আছে!!!

কিন্তু আমি যে দুর্বল এটা তাদেরকে কে বলল?

হয়ত আমি শক্তিশালী কিন্তু সেটা তারা জানে না!!?

আচ্ছা!!

তাদেরকে আমার শক্তি দেখাতে হবে, যেমন তারা অ্যামেরিকার শক্তি দেখেছে।

আর তখনি আমার সাথে ক্ষমতাশীলরা উষ্ম বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে।

তখনি সৌদি শাসক নড়েচড়ে বসবে,আমার সাথে চুক্তি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এই শাসকেই তো শ্যরন এর সাথে চুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিল।

ইয়াহুদী সন্ত্রাসী শ্যরন কি একজন মুসলিম জঙ্গির চেয়ে ভাল?!!!

সন্ত্রাসের (জঙ্গিবাদের) অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার এক মাত্র উপায় হচ্ছে --- তোমাকে শক্তিশালী হতে হবে।

ঠিক আছে .....।

কিছু সময় অপেক্ষা কর .....।

অচিরেই ইনশাআল্লাহ্ তোমরা আমরা শক্তি দেখতে পাবে .....।।

এটাই ইসলামী সন্ত্রাসীর বার্তা...।।

হে আল্লাহ্!

আপনি মুজাহিদিন সন্ত্রাসীদের ত্রাসকে আপনার পথে কবুল করুন।

হে আল্লাহ্! আপনি নিহত জঙ্গিদের রূহগুলোকে আপনার পথে গ্রহণ করুন।

https://www.facebook.com/notes/ahmad...০৯৭২৫২৬২৭৯৩৪১৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫২৯৪

প্রজা তার রাজার ধর্মই গ্রহন করে

আসুন! কুফুরী শাসন ধ্বংস করি।

আবু মুহাম্মাদ

Senior Member

১১-০১-২০১৬

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় মানুষ একে অপরকে জিজ্ঞেস করতঃ (আজ কাকে হত্যা করা হয়েছে? কাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে? কাকে চাবুক মারা হয়েছে ?) ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক ছিল স্থাপত্যবিদ। তখনকার সময়ে মানুষ বাড়ী-ঘর ও কলকারখানা নিয়ে কথা বলত ও নদী খনন ও বৃক্ষ রোপণ সম্পর্কে জানতে চাইত। সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক ছিল আশ্রয় ও মেহমানদারীর দিকে প্রশিদ্ধ, তাই মানুষ তখন উন্নত খাবার ও নিরাপত্তার খবর রাখত এবং তাদের মাজলিস সমূহ এই আলোচনা দিয়েই তাজা রাখত। কিন্তু যখন উমর ইবলে আব্দুল আজীজ খিলাফত পেলেন, মানুষ তখন প্রশ্ন করত: (কোরআন কতটুকু হিফজ করেছ? রাত্রে কত সময় ইবাদাতে কাটাও? মাসিক কয়টা রোজা রাখ?)

-

এই জন্যই বলা হয় #প্রজা তার রাজার ধর্মেই গ্রহন করে। যদি মাদক সেবী হয় তাহলে মাদক বেড়ে যাবে। যদি ব্যভিচারী হয় তাহলে তেমনই হবে। যদি লোভী ও কৃপন হয় তাহলে জনগণ তাই করবে। আর যদি হয় নরম, দানশীল ও বাহাদুর তাহলে তেমনই হবে। এবং যদি জালেম হয় তাহলে জুলুম বেরে যাবে।

-

কিন্তু যদি দ্বীনদার, মুত্তাকী, দয়ালু ও সৎ হয় তাহলে সমাজ ও জনগণ তেমনি হয়ে যাবে। আফসোস! তা কদাচিৎ কিছু ব্যক্তি ও সময়ে দেখা যায়। - ইবনে কাসীর।

.

যদি এমনই হয় তাহলে সরকার যখন নাস্তিক, ধর্মের অবমাননাকারী, মুরতাদ, জালেম হবে তখনই সে এলাকার জনগণের মধ্যে নাস্তিকতা বেড়ে যাবে, যেথায়-

সেথায় ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করা হবে, ইরতিদাদ ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে পরবে এবং প্রতিদিন অসংখ্য জুলুম হতে থাকবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৩৪৪

আরবের আলেমগণ কি মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধী?

Hazi Shariyatullah

Senior Member

০১-১৫-২০১৬

আরবের আলেমগণ কি মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধী?

প্রতি বছরই আমাদের দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ হজ্জে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনার উদ্দেশ্যে আরবভ,মি সফর করে থাকেন। এছাড়াও রুজি-রোযগারের উদ্দেশ্যেও আমাদের দেশের অনেক মানুষ সেখানে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। যে উদ্দেশ্যেই হোক, আরবের পুণ্যভ,মি সফর করতে পারা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। তবে সাম্প্রতিককালে আমাদের কিছু ভাই সেখান থেকে সফর করে এসে মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাঁদের সংকলিত ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্নরকম বিষোদগার করে থাকেন। এসব ফিকহী মাযহাব কোত্থেকে এল? আরবে মাযহাব এবং তাকলীদ বলতে তো কিছু নেই? আরবের আলেমগণ তো কোনো মাযহাব অনুসরণ করেন না ইত্যাদি নানা রকম মন্তব্য তাঁদের মুখে শোনা যায়। সাধারণ মানুষকেও তাঁরা মাযহাব এবং তাকলীদ সম্পর্কে বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ করে থাকেন।

অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিকাংশ আরব আলেম কোনো না কোনো মাযহাবেরই অনুসারী। কোনো কোনো আলেম সরাসরি কোনো মাযহাবের সাথে নিজেকে সম্পর্ক বা সম্বন্ধ না করলেও ফিকহ ও ফতোয়া, মাযহাব এবং মাযহাবের অনুসারীদের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করেন। আর সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদকে জরুরি মনে করে থাকেন। আলিমদের অনুসরণ ও তাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন। মাযহাব তাকলীদকে গোমরাহী আখ্যা দেওয়ার যে প্রবণতা তা ওখানের দায়িত্বশীল আলিমগণের বা অনুসরণীয় মাশাইখের প্রবণতা নয়। এটা মূলত অপরিপক্ক ইলমের অধিকারী আবেগপ্রবণ কিছু লোকের প্রবণতা।

এখানে নমুনা স্বরূপ সৌদি আরবের এমন কয়েকজন শাইখের বক্তব্য উল্লেখ করার প্রয়াস পাব, যাদেরকে মাযহাব ও তাকলীদ বিরোধীরাও অনুসরণীয় মনে করেন (বরং নিজেরাও তাদের অনুসরণ করে থাকেন)।

১. শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী-এর বক্তব্য:-

আরবের মাটিতে তাওহীদ ও সুন্নাহকে যিন্দা করা এবং শিরক-বিদআত নির্মূলে যারা অগ্রণী ভ,মিকা পালন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রাহ.। বর্তমানে সৌদি আরবের অধিকাংশ আলিম শাইখ নাজদী রাহ.-এর চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের সালাফী বন্ধুরাও তাঁর রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করে থাকেন। মাযহাব ও তাকলীদের বিষয়ে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী-এর অনেক বক্তব্য রয়েছে। কিছু এখানে উল্লেখ করছি। এক জায়গায় তিনি বলেন:

ونحن أيضاً في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير؛ الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم؛ ولا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.

অর্থ: আমরা ফিকহী বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। যারা চার ইমামের কোনো একজনের তাকলীদ করে আমরা তাদের উপর কোনো আপত্তি করি না। কারণ (চার ইমামের মাযহাব সংকলিতরূপে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে) অন্যদের মাযহাব সংকলিত আকারে বিদ্যমান নেই। তবে রাফেযী, যাইদিয়া, ইমামিয়্যাহ ইত্যাদি বাতিল মাযহাব-মতবাদের অনুসরণকে আমরা স্বীকৃতি দিই না। বরং তাদেরকে চার ইমামের কোনো একজনের তাকলীদ করতে বাধ্য করি। আদ দুরারুস সানিয়্যা ১/২৭৭

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর উপরোক্ত বক্তব্যই প্রমাণ করে তিনি চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণকে কতটা জরুরি মনে করতেন। সেই সাথে এটাও স্পষ্ট হল যে, তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যারা তাঁর নামে প্রচার করেছিল যে, 'তিনি তাকলীদকে বর্জন করেছেন এবং চার মাযহাবের গ্রন্থগুলিকে বাতিল বলেন' তিনি তাদের এই প্রচারণার বাস্তবতা খণ্ডন করে বলেছেন :

قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، و إني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء و إني أدعي الاجتهاد، و إني خارج عن التقليد... هذا بهتان عظيم

অর্থ : যারা আমার নামে প্রচার করছে যে, আমি চার মাযহাবের কিতাবগুলোকে বাতিল বলি, আমি নাকি বলি মানুষ ছয়শ বছর ধরে ভুলের উপর আছে, আমি ইজতিহাদের দাবি করেছি এবং তাকলীদকে বর্জন করেছি, (তাদের এই অপপ্রচারের জবাবে শুধু এটাই বলব,) এটা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ। আর রাসায়েলুস শাখসিয়্যাহ, পৃ. ৪

২. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ রাহ.

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রাহ. ছিলেন সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী এবং শায়খ ইবনে বায রাহ.সহ অনেক আলেমের উস্তায। তাঁর সম্পর্কে শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আলজিবরীন বলেন,

قد لاحظنا ان الشيخ ابن ابراهيم يشرح كتب الحنابلة كالروض المربع ونحوه ويقرر مسائله، ولا يخرج عنها إلا قليلا .

'আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ রাহ. হাম্বলী মাযহাবের কিতাবসমূহ যেমন 'আররওযুল মুরবী' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করতেন এবং এখানে উল্লেখিত মাসআলার প্রমাণাদি আলোচনা করতেন। খুব কমই এখান থেকে সরে আসতেন।' ভূমিকা : আল ইজায ফী ব'দী মাখতালাফা ফীহিল আলবানী ওয়াবনু আসাইমীন ওয়াবনু বায১/৬

৩. শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দী রাহ.

যে সকল মাসআলায় ফিকহ-ফতোয়ার ইমামগণের মাঝে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে ইখতিলাফ হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের কর্তব্য, নিজ অঞ্চলের আলিমদের ফতোয়া অনুসরণ করা। সালাফের যুগে এই নীতিই অনুসরন করা হত। অথচ অনেক সময় গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের দেখা যায়, তারা মতভেদপূর্ণ মাসআলায় নিজ দেশের আলিমদের পরিবর্তে আরব জাহানের আলিমদের ফতোয়া অনুসরণ করেন এবং অন্যদেরকেও তা মানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এটা সঠিক নিয়ম নয়। খোদ আরবের আলেমগণ বলে গেছেন, সাধারণ মানুষের কর্তব্য মতভেদপূর্ণ মাসআলায় নিজ দেশের আলিমদের তাকলিদ করা। যারা এই নীতি অনুসরন করতে বলেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন সৌদি আরবের শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দী রাহ.। তিনি শাইখ উছাইমীন রাহ.-এর উস্তায ছিলেন।

শাইখ উছাইমীন রাহ. বলেন,

فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم، وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: "العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم؛ لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع"

অর্থ : সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক হল নিজ দেশের আলিমদের তাকলীদ করা। এই বিষয়টি আমাদের উস্তায আব্দুর রহমান ইবনে সা'দী রাহ. বলে গেছেন। তিনি বলতেন : সাধারণ মানুষের জন্য অনুচিত নিজ দেশের আলিমদের পরিবর্তে অন্য দেশের আলিমদের তাকলীদ বা অনুসরণ করা। কেননা এর দ্বারা লাগামহীনতা ও বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ১৯/৩২ গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুরা যদি উপরোক্ত নীতি অনুধাবন করতেন এবং অনুসরণ করতেন তাহলে সকল ঝগড়া-বিবাদ এমনি খতম হয়ে যেত।

৪. শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহ.-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শাইখ ইবনে বায রাহ.-কে তাঁর ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন,

مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

'ফিকহের ক্ষেত্রে আমার মাযহাব হল, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব'। মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৪/১৬৬

তিনি আরো বলেছেন,

وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة، ويعترفون بفضل الأئمة الأربعة ويعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم في الله .

অর্থ : শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর অনুসারী সকলেই হাম্বলী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা চার ইমামকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন এবং চার মাযহাবের অনুসারীদেরকে নিজেদের দ্বীনী ভাই মনে করে থাকেন। মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/১৫০

ফিকহী মাযহাবগুলি সম্পর্কে সাধারণত আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুরা ধারণা করেন যে, এগুলো নতুন সৃষ্ট এবং এই ফিকহী মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করেছে এবং তাঁদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। শায়েখ ইবনে বায রাহ. এই ধারণা খন্ডন করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

و أنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهبي في أمور الفروع و اقع منذ قديم الزمان، ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق

অর্থ : আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করুন নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন যে, দ্বীনের ফুরু' বা শাখাগত মাসায়েলে ফিকহী মাযহাবসমূহের মধ্যে যে মতপার্থক্য তা নতুন নয় বরং প্রাচীনযুগ (সাহাবাযুগ) থেকেই চলে আসছে। আর এই মতপার্থক্য

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনোরকম হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিভক্তি সৃষ্টি করেনি। মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/১৪৯

দ্বীনের ফুরু‘ বা শাখাগত মাসায়েলে মতভিন্নতা যে সালাফ থেকেই চলে আসছে এবং এটা কোনো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয় এই বিষয়টি শাইখ ইবনে বায রাহ. অসংখ্য জায়গায় বলেছেন।

এক জায়গায় তিনি লেখেন,

فقد كان أصحاب الرسول ﷺ والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية، ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا...

অর্থ : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী উলামায়ে কেরাম শাখাগত অনেক মাসায়েলে মতভেদ করেছেন। কিন্তু এই মতভেদ তাঁদের মাঝে বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি করেনি কেননা তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল দলীলের ভিত্তিতে সত্যকে জানা। সুতরাং কোনো বিষয়ে যখন দলীলের মর্ম তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তখন তারা একমত হয়ে গেছেন। আর যখন তাঁদের কারো নিকট দলীলের মর্ম অস্পষ্ট ছিল তখন তাঁদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। কিন্তু কেউ তাঁর ভাইকে গোমরাহ বলেননি এবং এর ভিত্তিতে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার পিছনে নামায ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হননি। সুতরাং আমাদের সকলের কর্তব্য হল, আল্লাহকে ভয় করা। হককে আকড়ে ধরা। ঈমানী ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা এবং শাখাগত মাসায়েলে মতভিন্নতার দরুণ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত না হওয়ার যে আদর্শ সালাফে সালেহীন রেখে গেছেন তা গ্রহণ করা। মাজমুউ ফাতওয়া ইবনে বায ১১/১৪২-১৪৩

ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে লা মাযহাবী বন্ধুদের দৃষ্টিভংগী যে ইবনে বায রাহ.-এর দৃষ্টিতে ঠিক নয়, আশা করি উপরের আলোচনা দ্বারা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে।

৫. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আলউছাইমীন রাহ.-এর বক্তব্য :

সৌদি আরবের আরেকজন সম্মানিত আলিম, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আলউছাইমীন রাহ.-এরও মাযহাব ও তাকলীদের সমর্থনে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। তিনি নিজের ফিকহী মাসলাকের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পষ্ট বলেছেন,

نحن الآن مذهبنا مذهب الامام أحمد رحمه الله.

অর্থ : বর্তমানে আমাদের মাযহাব হল, ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মাযহাব।

লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ১২/১০০

মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে আরো লেখেন :

الانتماء الى المذهب ودراسة قواعده و أصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة.

অর্থ : কোনো মাযহাবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া এবং তাঁর উসূল ও কাওয়ায়েদ অধ্যয়ন করা মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে সহায়তা করে। মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইলে উছাইমীন ২৬/২৪৫

এছাড়া শাইখ উছাইমীন রাহ.-এর শরাহ-ভাষ্যসহ প্রকাশিত ইবনে কুদামা মাকদীসী রাহ.-এর 'লুমআতুল ই'তিকাদ' কিতাবে স্পষ্ট লিখা আছে

وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، و اتفاقهم حجة قاطعة.

অর্থ : দ্বীনের ফুরু' তথা শাখাগত বিষয়ে কোনো ইমামের সাথে সম্বন্ধ নিন্দার বিষয় নয়। যেমন চার মাযহাব। কারণ, ফুরু'-এর ক্ষেত্রে মতভেদ হচ্ছে রহমত। এই মতপার্থক্যকারীগণ তাদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আজর ও ছওয়াবের অধিকারী। তাদের মতপার্থক্য হল, প্রশস্ত রহমত আর তাদের মতৈক্য হচ্ছে অকাট্ট দলীল।

ইবনে কুদামা রা.-এর উপরোক্ত বক্তব্যকে দালিলিকভাবে প্রমাণ করতে গিয়ে শাইখ উছাইমীন রাহ.-এর ব্যাখ্যায় লেখেন,

الفروع: جمع فرع وهو لغة : ما بني على غيره، واصطلاحًا: ما لا يتعلق بالعقائد، كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها.

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرًا عن نية خالصة واجتهاد، لا عن هوى وتعصب؛ لأنه وقع في عهد النبي -ﷺ- ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة، حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي -ﷺ- على واحد منهم "رواه البخاري، ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون؛ ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة.

অর্থ : ...আর পরিভাষায় ফুরু'য়ী বা দ্বীনের শাখাগত মাসায়েল হল, যা আকীদা সম্পৃক্ত নয়, যেমন পবিত্রতা এবং নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল। আর এক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য, এটা কোনো নিন্দনীয় বিষয় নয়। যখন এর ভিত্তি হয় বিশুদ্ধ নিয়্যতের সাথে ইজতিহাদ। খেয়াল-খুশি বা অন্যায় পক্ষপাত নয়। কারণ তা নবীযুগেও সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তিনি এর উপর কোনো আপত্তি করেননি। যেমন বনু কুরাইযার যুদ্ধের সময় তিনি বললেন, তোমরা বনু কুরাইযায় আসরের নামায পড়বে। অতপর গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই আসরের সময় হয়ে গেল। একদল নামাযকে বিলম্বিত করলেন, বনী কুরায়যায় পৌঁছে নামায পড়লেন। আর একদল সময় চলে যাচ্ছে দেখে পথিমধ্যেই নামায পড়ে নিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল কোনো পক্ষের উপরই আপত্তি করলেন না, তিরস্কার করলেন না। আর তাছাড়া এধরনের মতপার্থক্য তো সাহাবীদের মাঝেও হয়েছে। আর তারা হলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম শ্রেণী। আর এই মতপার্থক্য উম্মাহর মাঝে কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ বা অনৈক্য সৃষ্টি করেনা। শরহু লুমআতুল ই'তিকাদ পৃষ্ঠা ১৬৪

যারা শাখাগত বিভিন্ন মাসায়েলে মতভিন্নতা দেখে ফিকহী মাযহাবসমূহের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ পোষণ করেন এবং একে উম্মাহর মাঝে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত করেন তাঁদের জন্য শাইখ উসাইমীন রাহ.-এর উপরোক্ত বক্তব্যে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে।

যারা ইজতিহাদী মাসায়েলে ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে গোমরাহ-বিদআতী হিসেবে আখ্যায়িত করে, তাঁদের কঠোর সমালোচনা করে শাইখ উছাইমীন রাহ. বলেন- 'যে বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে সে বিষয়ে কাউকে সুন্নাতের পরিপন্থী-বিদআতী বলতে আমি সংকোচবোধ করি। এটা উচিত নয়। ... এ বিষয়টি কারো গবেষণার বিরোধী হলে তাকে সরাসরি বিদআতী বলা খুবই কঠিন বিষয়। এ ধরনের বিষয়ে বিদআত শব্দ উচ্চারণ করা কারো পক্ষে উচিত নয়। কেননা যেসকল বিষয়ে গবেষণার অবকাশ থাকে এবং হতে পারে এ মতটি সঠিক অথবা ঐ মতটি সঠিক, তাতে পরস্পরে বিদআতের অপবাদ দিতে শুরু করলে মুসলিমসমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সূচনা হবে। ইসলামের শত্রুরা তা নিয়ে হাসাহাসি করবে। ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম পৃষ্ঠা ৩৯২

শাইখ উছাইমীন রাহ. সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদকে অত্যন্ত জরুরি মনে করতেন। বিশেষত মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলায় নিজ দেশের আলিমদের অনুসরণ এবং তাদের সাথে যুক্ত থাকার প্রতি জোর তাকিদ দিতেন। এক জায়গায় তিনি লেখেন:

أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالي (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

অর্থ : যেসব সাধারণ মানুষ সরাসরি শরীয়তের বিধি-বিধান জানতে সক্ষম নন তাদের জন্য তাকলীদ করা ফরয। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) তোমরা যদি না জান তাহলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা কর। আলউসূল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৮৭

নিজ অঞ্চলের আলিমদের অনুসরণের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে শাইখ উছাইমীন রাহ. বলেন:

...لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك، ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي... فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم.

অর্থ : ...নিশ্চয়ই তোমার কর্তব্য হল তাকলীদ করা। আর তোমার তাকলীদের সবচে বড় হকদার হল তোমার (দেশের) আলিমগণ। যদি তুমি তা না করে বাইরের দেশের আলিমদের তাকলীদ কর তবে তা লাগামহীনতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। সুতরাং সাধারণ মানুষের কর্তব্য নিজ দেশের আলিমদের অনুসরণ করা। লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ১৯/৩২

গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের ধারণা, তাকলীদ চতুর্থ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে। অথচ তাকলীদ সাহাবা যুগ থেকেই চলে আসছে। এ বিষয়ে শাইখ উছাইমীন রাহ. লেখেন :

والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهدنا هذا من لا يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه لجهله وقصوره، ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ بما قالوا، والأخذ بما قالوا هو التقليد.

অর্থ : বাস্তব কথা হল, তাকলীদ সাহাবা যুগ থেকেই চলে আসছে। কেননা সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে এই যুগ পর্যন্ত সবসময়ই এমন মানুষ থাকেন, যারা নিজে নিজে শরীয়তের বিধান জানতে সক্ষম নন। তাঁদের কর্তব্য, আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে সেই অনুপাতে আমল করা। আর এটাই তাকলীদ। ফতোয়া নূর আলাদদারবি ২/২২০

মাযহাব এবং তাকলীদ বিষয়ে শাইখ উসাইমীন রাহ. যা বললেন, এরপরেও যদি আমাদের ঐ বন্ধুরা আশ্বস্ত না হন তবে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।

৬. শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযানের বক্তব্য

সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযানেরও এ বিষয়ে বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে। মাযহাব অনুসরণ যে জরুরি এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে শায়খ সালিহ ফাওযান লেখেন:

هاهم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الاسلام ابن تيمية و ابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي و ابن حجر شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيا و ابن عبدالبر كان مالكيا.

অর্থ : বড় বড় হাদীস বিশারদ ইমামগণ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও ইবনুল কায়্যিম রাহ. ছিলেন হাম্বলী, ইবনে হাজার রাহ. ও ইমাম নববী রাহ. ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম ত্বহাবী রাহ. ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইবনু আব্দিল বার রাহ. ছিলেন মালেকী মাযাহবের অনুসারী। ইয়ানাতুল মুসতাফিদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ ১/১২

৭. শায়েখ আবু বকর জাবের আল জাযায়েরী রাহ.-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, মসজিদে নববীর ওয়ায়েজ আবু বকর জাবের জাযায়েরী সূরা আম্বিয়া এর ৭নং আয়াত **فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون**-এর তাফসীরে লেখেন :

وفي الآية دليل على وجوب تقليد العامة العلماء، إذ هم أهل الذكر، ووجوب العمل بما يفتونهم به ويعلمونهم به.

অর্থ : উপরের আয়াতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে সাধারণ মানুষের উপর উলামাদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। কেননা আয়াতে 'আহলুয যিক্র' বলে উলামাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং আলেমগণ যা ফতোয়া দেন, যা শিক্ষা দেন সেটার উপর আমল করা ওয়াজিব। আইসারুত তাফাসীর পৃ. ৭৭০

৮. শায়খ আতিয়্যা সালিম-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের আরেকজন প্রসিদ্ধ আলিম, মসজিদে নববীর মশহুর মুদাররিস এবং মদীনা মুনাওওয়ারার কাযী শায়খ আতিয়্যা সালিম রাহ. যারা ফিকহী মাযহাবের দলীল নির্ভর মতভেদকে দোষণীয় মনে করেন এবং উম্মাহর মাঝে বিভেদ-বিচ্ছন্নতা জ্ঞান করে একে নির্মূল করার চেষ্টা করছেন তাঁদের চিন্তাকে সংশোধন করে বলেন:

إن الاختلاف أمر من لوازم البشر، ولا يمكن رفعه، ولأنه لا يشكل خطرا على الأمة، فقد كانوا يختلفون في الرأي مع اتحاد كلمتهم وتوحيد صفوفهم.

অর্থ : নিশ্চয়ই ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা মানুষের স্বভাবজাত একটি বিষয়। এটি নির্মূল করা সম্ভব নয়। (দলীল নির্ভর) ইখতিলাফ উম্মাহর জন্য কোনো ক্ষতিকর বিষয় নয়। তাঁরা (সালাফে সালেহীন) অনেক বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মাঝে কোনো বিভেদ ছিল না। মাওকিফুল উম্মাহ মিন ইখতিলাফিল আইম্মাহ পৃ. ১৪

৯. শায়খ শানকীতি রাহ.-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন শায়খ শানকীতি রাহ.। তাঁর 'আযওয়াউল বয়ান' তো খুবই প্রসিদ্ধ। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ উসাইমীন রাহ.ও অনেক সময় 'আযওয়াউল বয়ান' কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে থাকেন। (দ্র. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম পৃ. ৩৯৭) এই কিতাবে শায়খ শানকীতি রাহ. লেখেন-

ولم يختلف العلماء، أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

অর্থ : এ বিষয়ে কোনো আলিমের দ্বিমত নেই যে, সাধারণ মানুষের জন্য আলিমদের তাকলীদ করা আবশ্যক। কেননা আয়াতে আহলুয যিকর দ্বারা আহলে ইলমই উদ্দেশ্য। -আযওয়াউল বয়ান ৭/৪৯৫

তিনি আরো লেখেন-

وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر، وهم العلماء أو العلماء والأمراء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার আনুগত্য করার, রাসূলের আনুগত্য করার এবং 'উলুল আমর'-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আলেমগণ অথবা উলামা ও উমারা উভয়ই। তাঁদের আনুগত্যের অর্থ হল, তাঁরা যে ফতোয়া দেন সেই বিষয়ে তাদের তাকলীদ করা। -আযওয়াউল বয়ান ৪/৫০১

১০. রাবেতা আলমে ইসলামীর সিদ্ধান্ত

সবশেষে ফিকহি মাযহাবের ইখতিলাফ ও মতভিন্নতার ধরন সম্পর্কে বর্তমান যুগের বড় বড় মনীষীর প্রতিনিধিত্বে ১৪০৭ হিজরীতে 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী' মক্কা মুকাররমায় যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল তার মূল অংশ তুলে ধরছি-

"মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত চিন্তানৈতিক মতবিরোধ সাধারণত দু'ধরনের।

ক) আকীদা ও বিশ্বাসগত মতবিরোধ।

খ) আহকাম ও বিধানগত মতবিরোধ।

প্রথমোক্ত মতবিরোধ...। আর দ্বিতীয়তটি হল, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাবসমূহের মতপার্থক্য, যার অনেক শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। এবং যাতে আল্লাহ তাআলার নিগূঢ় হিকমত রয়েছে। যেমন বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ এবং নুসূস থেকে আহকাম ও বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তাছাড়া এটা হল অল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নিআমত এবং ফিকহ ও কানুনের

মহাসম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা দিয়েছে। ফলে তা নির্ধারিত একটি হুকুমের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোনো অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ নেই। বরং যে কোনো সময়ই কোনো বিষয়ে যদি কোনো একজন ইমামের মাযহাব সংকীর্ণতার কারণ হয়ে যায় তাহলে শরঈ দলিলের আলোকেই অন্য ইমামের মাযহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে। তা হতে পারে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা মুআমালা সংক্রান্ত অথবা পারিবারিক কিংবা বিচার ও অপরাধ সংক্রান্ত। তো আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের মাযহাবী ইখতিলাফ আমাদের দ্বীনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরোধিতাও নয়। এ ধরনের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। এমন কোনো জাতি পাওয়া যাবে না যাদের আইন-ব্যবস্থায় এ ধরনের ইজতিহাদী মতপার্থক্য নেই।

অতএব বাস্তবতা এই যে, এ ধরনের মতভেদ না হওয়াই অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন নুসূসে শরয়ী অনেক ক্ষেত্রে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে অন্যদিকে শরয়ী নস সম্ভাব্য সকল সমস্যাকে সুস্পষ্টভাবে বেষ্টন করতে পারে না। কারণ নুসূস হল সীমাবদ্ধ আর নিত্য-নতুন সমস্যার তো কোনে সীমা নেই।

অতএব কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া এবং আহকাম ও বিধানের ইল্লত, বিধানদাতার মাকসাদ; শরীয়তের সাধারণ মাকসাদসমূহ বোঝার জন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতে হবে।

এখানে এসেই উলামায়ে কেরামের চিন্তার বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন দিকের কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আসে। অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হক্ব ও সত্যের অনুসন্ধান। কাজেই যার ইজতিহাদ সঠিক হবে তিনি দুটি বিনিময় পাবেন এবং যার ইজতিহাদ ভুল হবে তিনি একটি বিনিময় পাবেন। আর এভাবেই সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং যে মতপার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের ধারক তা বিদ্যমান থাকলে দোষ কেন হবে? বরং এ তো মুমিন বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহ। বরং মুসলিম উম্মাহর গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু মুসলমান তরুণ, বিশেষত যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামী জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে কিছু গোমরাহকারী লোক

তাদের সামনে ফিকহী মাসআলার এজাতীয় মতপার্থক্যকে আকীদার মতভেদের মতো করে তুলে ধরে। অথচ এ দু'য়ের মাঝে আকাশ-পাতালের ব্যবধান!

দ্বিতীয়ত যে শ্রেণীর লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জনের আহবান করে এবং ফিকহের মাযহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে এবং মানুষকে নতুন ইজতিহাদের মধ্যে নিয়ে আসতে চায় তাদের কর্তব্য, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা, যা দ্বারা তারা মানুষকে গোমরাহ করছে এবং ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন ইসলামের দুশমনদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করা।" -মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহী, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা : ৫৯, ২১৯

উপরোক্ত রেজুলেশনে যাদের স্বাক্ষর রয়েছে : 'আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায, রঈস; ড. আব্দুল্লাহ উমর নাসিফ, নায়েবে রঈস; মুহাম্মাদ আশশাযিলী আননাইফার, সদস্য; মুহাম্মাদ আলহাবীব ইবনুল খাওজা, সদস্য; মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুবায়্যিল, সদস্য; আবুল হাসান আলী নদবী, সদস্য; আবু বকর জুমী, সদস্য; মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর, সদস্য; সালেহ ইবনে ফাওযান আলফাওযান, সদস্য; মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসাওয়াফ, সদস্য; আব্দুল্লাহ আবদুর রহমান আলবাসসাম, সদস্য; মুস্তফা আহমাদ আযযারকা, সদস্য; মুহাম্মাদ রশীদ রাগেব কাবানী, সদস্য; ড. আহমাদ ফাহমী আবু সুন্নাহ, সদস্য; মুহাম্মাদ সালেম ইবনে আবদুল ওয়াদূদ, সদস্য।"

মোটকথা সৌদি আরবের মূল ধারার আলেমগণ মুজতাহিদ ইমামও তাদের সংকলিত ফিকহী মাযহাবসমূহের ব্যাপারে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। তারা কখনোই মাযহাবের অনুসারীদের ব্যাপারে অশালীন মন্তব্য করেন না। যারা এই ধরনের কাজে ব্যতিব্যস্ত তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে গিয়েছে। সুতরাং যেই জিনিস হেজাযের বাইরে থেকে হেজাযের ভিতরে প্রবেশ করেছে সেটাকে আরবের মনে করে এই দেশে নিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

[Collected]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৭৪৩

এ দ্বীন তাত্ত্বিকতার না, এ মানহাজ নিষ্ক্রিয়তার মানহাজ না

Abu Anwar al Hindi

Senior Member

০৬-২০-২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

ইন্নালহামদালিল্লাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া ‘আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাম তাসলিমান কাসীরা ‘আম্মা বা’আদ

মালিকুল মুলক রাব্বুল ‘আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন –

“মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।” (সূরা সফ, ৬১: ২-৪)

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [আত তাওবাহ, ১৬]

আপনি কি সেসব লোককে দেখেননি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি ক্বিতালের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর ক্বিতাল ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা

সীমিত। আর আখিরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। [আন-নিসা, ৭৭]

গত বেশ কয়েক বছরে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াহ সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যানে বেশ অনেকটুকুই ছড়িয়ে পড়েছে। যে প্রজন্মের আগে সময় কাটতো জাহিলিয়্যাহর বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে, আজ তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের কাছে এসব কিছু ছাপিয়ে জিহাদের ডাক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যারা আগে নিজেদের সালাত নিয়েই চিন্তা করতো না, আজ উম্মাহর রক্তের নদী দেখে তাদের হৃদয় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।। কুফফার ও তাওয়াগীত যতোই জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, যতোই জিহাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছে, যতই জিহাদের ডাককে চাপা দিতে চাইছে ততোই এ ডাক আরো ছড়িয়ে পড়ছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর স্বীয় কাজে প্রবল থাকেন যদিও অধিকাংশ লোকেরাই তা জানেন না।

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [আত তাওবাহ, ৩২]

তবে চিরাচরিত সত্য হল একটি কাজ যখন শুরু হয় তখন মান নিয়ন্ত্রন করা যতোটুকু সহজ হয়, কাজের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তা আর অতোটা সহজ থাকে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে এটা সাধারন ভাবে সত্য। এ কথা অনলাইন দাওয়াহ ও দা'ঈদের ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা যদি অনলাইনে জিহাদের দাওয়াহ এবং দা'ঈদের দিকে তাকাই তাহলে এ সত্যের প্রমান পাওয়া যায়। যে মানহাজের দাওয়াহ আমরা করছি, যে মানহাজের অনুসরন আমরা করছি তার শর্ত, বৈশিষ্ট্য এবং দাবিগুলো সম্পর্কে দেখা যায় অনেক ভাই-ই ওয়াকিবহাল নন।

যেমন, আজকাল একটি কথা খুব বেশি শোনা যায় আর তা হল "মানহাজের ভাই" বা "অমুক আমাদের মানহাজের"। এধরনের কথা দ্বারা বোঝানো হয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জিহাদের মানহাজের অনুসারী। মুসলিম হিসেবে আমাদের মুসলিম পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকাই যথেষ্ট। 'আমভাবে এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই, এক মুসলিমের সম্পদ, রক্ত, সম্মানকে তার মুসলিম ভাই হেফাযত করবে। পরিচয় হিসেবে এটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। সেখানে আলাদা করে "মানহাজের ভাই" বা

এধরনের শব্দাবলীর প্রয়োগ কতোটা যৌক্তিক সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ, তার উপর এ ধরনের শব্দাবলী ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন ভাবে। খোজ নিলে দেখা যায় যাকে বা যাদেরকে "মানহাজের ভাই" বলা হচ্ছে তিনি না কোন জিহাদী তানযীমের সাথে যুক্ত, আর না সক্রিয়ভাবে কোন ধরনের জিহাদী কর্মকান্ডের সাথে। এবং এই ভাইদের বিশাল একটা অংশকে যখন জিহাদের কাজের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যান। বিশেষ করে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে সেলিব্রিটি হিসেবে এবং "জিহাদী সেলিব্রিটি, মানহাজের ভাই" হিসেবে পরিচিত তাদের জন্য এটা প্রায় ১০০% ক্ষেত্রে সত্য। তাহলে এ কোন মানহাজের কথা হচ্ছে? যারা এরকম বলে থাকেন তাদের মধ্যে প্রচলিত ধারনাটা হল যে ব্যক্তি জিহাদ সমর্থন করে, কিংবা তানযীম আল-ক্বা'ইদাকে সমর্থন করে। যারা জিহাদ সমর্থন করেন, যারা ৯/১১ সমর্থন করেন, শাতেম মারা সমর্থন করেন, জিহাদ করা উচিত সমর্থন করেন তারা হল "মানহাজের ভাই", তারা হল আমাদের "মানহাজের"। কিন্তু আসলে কি মানহাজ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়, মানহাজ বলতে কি নিছক কোন তাত্ত্বিক ও নিষ্ক্রিয় সমর্থনের মনোভাবকে বোঝানো হয়? আর এটা কি বৈশ্বিক জিহাদ তথা তানযীম আল-ক্বা'ইদার মানহাজ?

মানহাজ বলতে আসলে কি বোঝানো হয়? নাতিদীর্ঘ অ্যাকাডেমিক আলোচনায় না গিয়ে সাধারন ভাবে বলা যায় মানহাজ হল কর্মপদ্ধতি। যদিও মানহাজের সবচেয়ে প্রচলিত সংজ্ঞা হলঃ মানহাজ হল 'ইলম, গ্রহন, বিশ্লেষন ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি, তথাপি একথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত মানহাজের পরিধি শুধুমাত্র 'ইলম অর্জন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমিত না, বরং তা আরো ব্যাপক। আধুনিক সময়ে মানহাজের সর্বাধিক প্রচলিত অর্থ হল দ্বীন কায়েমের জন্য কর্মপদ্ধতি। যেমন ধরুন, কেউ যদি বলে দ্বীন কায়েমের পন্থা হল দাওয়াত ও তাযকিয়্যাহ এবং এ বিশ্বাসের উপর কাজ করে, তবে তার মানহাজ হল দাওয়াহ ও তাযকিয়্যাহর মানহাজ। যেমন তাবলীগ জামাত। কেউ যদি বলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপায় হল ইসলামী সমাজ বিনির্মান ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া, এবং সে এই তত্ত্বের উপর আমল করে তবে এটা তার মানহাজ। যেমন - জামায়াতে ইসলামী বা ইখওয়ানুল মুসলিমীন। কেউ যদি মনে করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ হল আথারী আক্বীদার দাওয়াহ দেওয়া, এবং সে এই বিশ্বাসের উপর কাজ করে তবে তার

সেটাই তার মানহাজ, যেমন শায়খ আলবানীর সালাফি দাওয়াহ। কেউ যদি মনে করে উম্মাহর উত্তরনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তারবিয়্যাহ, তাসফিয়াহ, তা'লীম, দাওয়াহ, এবং সে এই বিশ্বাসের উপর 'আমল করে তবে সেটাই তার মানহাজ।

এখানে লক্ষনীয় হল মানহাজ সরাসরি আমলের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। মানহাজ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। নিছক সমর্থন বা সহমর্মিতার সাথে না। একারনে শুধুমাত্র সমর্থনের সাথে মানহাজের যোগসূত্র খোজা হাস্যকর। নির্দিষ্ট কোন একটি আদর্শ ধারন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি মানহাজের অনুসরন সম্ভব। তবে জিহাদের ক্ষেত্রে যখন এটা বলা হয় তখন এটা আরো বেশি গুরুতর একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারন জিহাদ হল একটি ইবাদাত, যা আমাদের সময় একটি ফরয ইবাদাত। ইবাদাতের ক্ষেত্রে সমর্থনের কোন ধারনা সাহাবায়ে কেরামদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামে কখনই ছিল না। কোন সুস্থ মস্তিকের দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনি কখনো বলতে দেখবেন না, "আমি মাগরিবের তিন রাকাত সালাত" সমর্থন করি। নিজে আদায় করি না।" তার চেয়েও বড় কথা হল এই ব্যাক্তিকে কেউ কখনো আমার "নামাজী ভাই" বলে কিন্তু সম্বোধন করবে না, আর নাই বা সে নামাজী হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য হবে শার'ঈ দৃষ্টিকন থেকে কিংবা সাধারন মানবিক বিচার-বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে, যতোক্ষন না সে ফরয সালাত আদায় না করছে। একইভাবে কেউ কিন্তু কখনো বলে না "আমি রামাদ্বানের সিয়াম সমর্থন করি, ফরয মনে করি, যারা সিয়াম পালন করছে তাদের সমর্থন করি, তারা খুব ভালো কাজ করছে, তবে আমি নিজে সিয়াম পালন করি না।" সম্ভবত এখানে একটু ভুল করলাম। দুঃখজনক ভাবে আমাদের সময়ে কিছু যিন্দিক এবং নামধারী "সেক্যুলার" মুসলিম বাংলাদেশে আছে যারা এমন কথা বলে। তবে শার'ঈ ভাবে এ ধরনের কথার কোন ভিত্তি নেই, এবং ফারয আমল থেকে বিনা ওজরে বিরত থাকার কারনে এই ব্যক্তি ফাসিক্ব বলে গন্য হবে। এই দ্বীন তাত্ত্বিকতার দ্বীন না, দ্বীনের আবশ্যক বিষয়ে সমর্থনের জায়গা আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। ইবাদাতের বিষয়গুলো আমাদের সমর্থন সাপেক্ষ নয়, বরং এগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক হল শোনার ও মানার। আপনি জেনেছেন ফযরের দুই রাকাত সালাত ফরয এখন আপনি বাধ্য এই দুই রাকাত সালাত আদায় করতে। আপনি যদি তা না করেন

তাহলে আপনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলেন এবং আপনার এ অবস্থানের কোন শার'ঈ যৌক্তিকতা বা জাস্টিফিকেশান নেই। এখানে আপনি সমর্থনের কথা বলে পার পাবেন না।

এখন চিন্তা করুন জিহাদের কথা। সালাফদের, সকল মাযহাবের ইমামদের অবস্থান অনুযায়ী বর্তমানের জিহাদ ফারযুল আইন। অর্থাৎ বর্তমানে জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয যেভাবে ব্যক্তির উপর ফযরের দুই রাকাত সালাত ফরয। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, "মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা" শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম]। একই সাথে শাহ আব্দুল আযীযের বিখ্যাত ফাতাওয়া, যা এখনো রদ করা কিংবা অপবনোদন করা এখনো সম্ভব হয়নি অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল হারব, যেখানে জিহাদ ফরয। এবং যেসব "জিহাদ সমর্থক মানহাজের ভাই" আছেন তারাও জিহাদ যে ফারযুল আইন তা স্বীকার করেন। তাহলে প্রশ্ন হল কেউ যদি এটা স্বীকার করে তবে তার করণীয় কি? অবশ্যই তার জন্য আবশ্যক এই ফরয কাজে শামিল হওয়া। এখানে মাঝামাঝি কোন কিছু নেই। দ্বীনের যেকোন ফরয বিধান সম্পর্কে ব্যক্তি অবগত হওয়া মাত্র তার উপর ওই বিধান ফরয। অর্থাৎ সে বাধ্য তখন তা পালন করতে। এখানে নিছক সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। আর মুসলিম মাত্রই জিহাদ সমর্থন করে, শাহবাগী ফরিদউদ্দীন মাসউদও জিহাদ সমর্থন করে, কারন জিহাদ অস্বীকার করা কুফর। সমস্যাটা জিহাদ সমর্থন নিয়ে কখনোই ছিল না, যে 'আলিমরা সালাহ আদ-দ্বীনকে বলেছিল ক্রুসেডারদের সাথে মিত্রতা করতে তারাও কিন্ত জিহাদ সমর্থন করতেন।

কিন্ত তারা কি সমর্থন করতে না? তারা কিসের বিপক্ষে ছিলেন? তাদের সমস্যাটা কি নিয়ে ছিল? তাদের সমস্যা ওই মূহুর্তে জিহাদ করা নিয়ে। তাদের সমস্যা ছিল তাত্ত্বিকভাবে যা দ্বীনের ফরয বিধান হিসেবে স্বীকার তারা করছেন তার উপর সঠিক ভাবে আমল করা নিয়ে। নিজে জিহাদ করা নিয়ে। যতোক্ষন জিহাদ একটি দূরবর্তী, তাত্ত্বিক বিষয় থাকে ততোক্ষন সবাই এর পক্ষেই কথা বলে। কিন্ত যখনই তাগুতের সামনে আজ, এখন, এখানে জিহাদ করার কথা আসে, তখন সমস্যাটা ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়। দুঃখজনক ভাবে এই হাজার বছর পুরনো ব্যাধি এখনো প্রবল বিক্রমে বিদ্যমান, এবং আজ শুধুমাত্র উলামায়ে সু'রাই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত না।

এতো গেল ফরয জিহাদের কথা, আর জিহাদের মানহাজ অর্থাৎ দ্বীন কায়েমের

পদ্ধতি হিসেবে জিহাদকে বেছে নেওয়া এবং তার অনুসরন করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"সুতরাং, এই মানহাজ, যা আমাদের সামনে সুবাহের ন্যায় স্বচ্ছ, তা কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা শারী'আহ্-এর দালীলে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেনঃ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যে কেউই তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ অপর এক ক্বওম নিয়ে আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, এবং যারা আল্লাহ্কে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কুফফারদের প্রতি অতি কঠোর, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।'[আল-মাইদাহঃ৫৪]

সুতরাং, এই আয়াতটি আমরা যে অবস্থার মধ্যে আছি সেই সম্পর্কে বলছেঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যে কেউই তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে,..." যখন রিদ্দাহ্/দ্বীন-ত্যাগ সংঘটিত হয়, তখন মানুষকে দ্বীন ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য কি কি গুণাবলীর প্রয়োজন? তো এখানে ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার কথা থেকে শুরু করেঃ

"...যাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কুফফারদের প্রতি অতি কঠোর,..."। সুতরাং, এই গুণাবলী অর্জন করা আমাদের জন্য খুবই জরুরীঃ

[১] আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি একান্ত ভালোবাসা

[২] ঈমানদারদের প্রতি বিনয় ও সহানুভূতি

[৩] কল্যাণের সাথে সাহায্য করা এবং তা করা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে

[৪] কুফফারদের প্রতি কঠোরতা, আর এটা ইসলামের সবচাইতে শক্তিশালী বন্ধনঃ আল-ওয়ালা' ওয়াল-বারা' (আনুগত্য এবং সম্পর্কচ্ছেদ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, আমরা ঈমানদারদের সাথে আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার সম্পর্ক

স্থাপন করি, এবং আমরা কুফফারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি, আর তাদের সাথে খুব কঠোর আচরণ করি।

[৫,৬] এরপর ৫ম এবং ৬ষ্ঠ গুণাবলী হলঃ "...তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না..."।

আর, মানুষদেরকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করা – এ বৈশিষ্ট্য দু'টির গুরুত্ব অত্যাধিক। সুতরাং, যারা এমন মনে করে যে, মানুষকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব (এই গুণাবলী অর্জন ব্যতীত) এবং একটি ইসলামিক ভূমি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যখন কিনা ইসলামের ছায়া পৃথিবীর বুক থেকে অপসারিত হয়েছে, তবে এমন মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার মানহাজ উপলব্ধি করতে পারেন নি। কারণ এই আয়াতটি সম্পূর্নরূপে স্বচ্ছ এবং স্পষ্টত প্রতীয়মান একটি আয়াত। [মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

অতঃপর শায়খ উসামা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিমোক্ত হাদীসটি উল্লেখ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর বলেন –

"আর আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, আর তা হলঃ শ্রবন, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরাহ এবং জামা'আহ।"
[ইমাম আহমাদ ও ইমাম আত-তিরমিযির দ্বারা বর্ণিত]

এখানে বিষয়টি হল, প্রথম পাঁচটি বিষয় যা হল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, এগুলোকে অপর পাঁচটি বিষয় ব্যতীত মানবজাতির জন্য একটি শাসনব্যবস্থা বা কর্মপদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একইভাবে একজন ব্যক্তির পক্ষে কমপক্ষে এবং অন্তরের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়, যখন সে মানবরচিত বিধানের দ্বারা শাসন করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের কর্তৃত্ব থাকে না। আর আমরা যদি এই পাঁচটি বিষয়কে মনযোগ দিয়ে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন গোত্রের প্রতি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর দা'ওয়াহ্-এর বাস্তবতার সাথে এই পাঁচটি বিষয় সম্পূর্নরূপে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দৃঢ়সমর্থকঃ*

আর আমরা যখন আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রসূলের ﷺ সুন্নাহর অনুসরণের চেষ্টা করি, তখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, ইসলামিক স্টেইটের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনের সম্প্রসারণের পদ্ধতি হিসেবে এগুলোর কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছেঃ

[১] একটি জামা'আহ্

[২] আদেশ শোনা

[৩] আনুগত্য করা

[৪] হিজরাহ করা

[৫] জিহাদ করা

সুতরাং, যারা হিজরাহ করার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত ইসলামের জন্য কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে এরূপ মানুষেরা মুহাম্মাদের ﷺ মানহাজ উপলব্ধি করতে পারেনি। আর যদি তারা বুঝে থাকে, তবে তারা এর উপর 'আমল করেনি, বরং তারা অন্যান্য ধরনের আনুগত্য ও 'ইবাদাতের দ্বারা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছে। সুতরাং, এরূপ মানুষেরা এ সকল বড় 'ইবাদাতসমূহের ভারী ফলাফল থেকে পলায়ন করছে, কারণ নিশ্চয়ই জিহাদ একটি কষ্টকর 'আমল, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, জামা'আহ্ ও জিহাদের গুরুত্ব অত্যাধিক।"

[মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

সুতরাং, কিছু সুনির্দিষ্ট গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্য এ মানহাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শায়খ উসামা বিন লাদিনের ভাষায় একজন ব্যক্তি তখন এ মানহাজের অনুসরনকারী হবে যখন সে মানহাজের আবশ্যক শর্তাবলীর উপর আমল করবে। অর্থাৎ সে জামা'আবদ্ধ হবে, শুনবে ও মানবে, হিজরাহ ও জিহাদ করবে। অর্থাৎ মানহাজের বিষয়টি আমলের সাথে সম্পর্কিত কোন একটি মনোভাব ধারন করার সাথে না, এবং এটাই স্বাভাবিক। এবং শায়খ উসামা বিল লাদিনের রাহিমাহুল্লাহর কথা থেকে স্পষ্ট যে এ মানহাজ সমর্থনের মানহাজ না, বরং এ মানহাজ হল জামা'আবদ্ধ হওয়া, শোনা ও মানা, হিজরাহ ও জিহাদের মানহাজ। এবং এখানে জামা'আবদ্ধ

হবার উল্লেখ দেখে অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই, কারন জিহাদ মূলত একটি জামা'আবদ্ধ ইবাদাত। [আমরা এক্ষেত্রে জামা'আবদ্ধ হওয়া বলতে একটি খাস মুক্বাতীল জামা'আকে বোঝাচ্ছি, এবং নিজেদের জামা'আর ব্যাপারে 'আম অর্থ প্রয়োগ করে নিজেদের জামা'আহকেই খাওয়ারিজদের মতো মুসলিমদের একমাত্র বৈধ জামা'আ মনে করি না]

তাহলে কিভাবে একজন ব্যক্তি যে এ কাজগুলো উপযুক্ত ওজর ছাড়া ছেড়ে দেয়, কিন্তু বলে সে এ মানহাজের সমর্থন করে তাকে "মানহাজের ভাই" বলা যেতে পারে? শার'ঈ বিচারে, মানহাজের অর্থগত বিচারের এবং বর্তমান সময়ে যারা জিহাদের মানহাজকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন তাদের বিবৃত মাপকাঠির আলোকে, কোন বিবেচনাতেই তো এরকম একজন ব্যক্তিকে - সে যতোই অন্তরঙ্গ বন্ধু বা শ্রদ্ধাভাজন দ্বীনি ভাই হোন না কেন – এই মানহাজের অনুসারী বলা যায় না। সমর্থনের কোন মানহাজ এ দ্বীনের মধ্যে নেই। এ দ্বীন তো মাদ্রিদ-বার্সেলোনার এল ক্লাসিকো না, বা ভারত-পাকিস্তান খেলা না, যে জার্সি পরে সমর্থন করলেই হয়ে গেল। এটাতো এমন হয়ে গেল যেন কেউ বলছে "আমি প্রাউড নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম" আর তারপর আরেকজন এসে বললো "হ্যা উনি সাচ্চা মুসলিম"! দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম কথার, এরকম অবস্থানের কোন ভিত্তি কি আদৌ আছে?

বরং শায়খ উসামা তো যথার্থই বলেছেন এ মানহাজ কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনি ভাবে প্রতিটি মানহাজের কিছু সুনিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুনাবলী যার। যার আদর্শ ও আমলে যে মানহাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে তিনি সে মানহাজের। এতো নিছক মৌখিক দাবির বিষয় নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশে ইসলামের জন্য, দ্বীনের সুরক্ষার জন্য, খেদমতের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মাহর জন্য, হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের দিকে তাকিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজটি করা উচিত, আপনি কোন কাজটি করবেন? জবাবে কেউ যদি বলেন বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইমান ও আমলের মেহনত তাহলে সেটা তার মানহাজ - যদি কেউ বলেন বাংলাদেশে কাজ আক্বিদা সাহীহ করা, শিরক-বিদ'আ দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে দূর করা তবে সেটা তার মানহাজ - যদি কেউ বলেন ক্রিটিকাল থিংকিং করা, শারীয়াহ নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করা, ইসলামের সংস্কার করা, তবে সেটাই তার মানহাজ - যদি কেউ বলে বাংলাদেশে কাজ ইসলামী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

তৈরি করা, সমাজ সেবা করা, তবে সেটাই তার মানহাজ - কারো উত্তর যদি হয় বাংলাদেশে কাজ হল 'ইলম চর্চা, তাজউয়ীদ শেখা, আরবী শেখা ও শেখানো তবে সেটাই তার মানহাজ - যদি কেউ বলে বাংলাদেশে কাজ হল মিডিয়া সেল তৈরি করে মিডিয়া দাওয়াহ করা তবে সেটাই তার মানহাজ। কিন্তু এর কোনটি তাওহীদ ওয়াল হাদীদের, দাওয়াহ ওয়াল জিহাদের মানহাজ না। কারন উপরোক্ত মানহাজের উপর আমলকারীরা এ কাজগুলো করেন কিন্তু তারা জিহাদ করেন না। শুধুমাত্র মুক্বাতীল জামা'আর সদস্যদের মধ্যেই ক্বিতালের এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, একারনে ক্বিতালের এ ফারযিয়্যাত একমাত্র মুক্বাতীল জামা'আর সদস্যরাই পালন করছেন অন্যান্য কাজগুলো করার পাশাপাশি। এবং এজন্য জরুরী নয় যে জামা'আর সকল সদস্যই ক্বিতাল করুক, বরং মুক্বাতীল জামা'আর সদস্য হিসেবে যে ভাই মিডিয়ার কাজ করছেন তিনি ক্বিতালের সহায়ক ও সম্পূরক হিসেবেই তাই করছেন। তিনি ক্বিতাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিডিয়ার কাজ করছেন না। একই কথা সে দা'ঈ ভাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যিনি আল্লাহর ইবাদাত ও তাগুত বর্জনের প্রতি দাওয়াহ দিচ্ছেন, এবং ব্যাক্তি যাতে এ নীতির উপর আমল করতে পারে, যাতে করে ব্যাক্তি মিল্লাতু ইব্রাহীমের উপর চলতে পারে সে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, এ নীতির উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে এমন জামা'আর সাথে তিনি নিজে আবদ্ধ হয়েছেন এবং অন্যকে আহবান করছেন। অন্যদিকে উপরোক্ত মানহাজ সমূহের উপর আমলকারীর নিজেরা জিহাদের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকেন, এবং অন্যদেরকেও নিষ্ক্রিয় হবার শিক্ষা দেন, আর তাদের সক্রিয়তা থাকে শুধু নিষ্ক্রিয় সমর্থনের ক্ষেত্রে। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুআতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

উহুদের দিন যারা যুদ্ধে যায় নি তারা জিহাদ সমর্থন করতো কি করতো না, তা নিয়ে কিন্তু সৃষ্টি জগতের কারো আগ্রহ নেই। খন্দকের দিনগুলোতে কে জিহাদ সমর্থন করে আর কে করে না এ হিসাব কিন্তু করা হয় নি। তাবুকের সময় যারা পেছনে বসে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কি জিহাদ সমর্থন করতো কি না – সে বিষয় ক্বুর'আনের কোন আয়াতই নাযিল হয় নি। পরিমাপ করা হয়েছে আমল। যারা মু'মিন তাদের বিশ্বাসের প্রমান তারা কাজের মাধ্যমেই দিয়েছে। আর যারা ওজরবিহীন ভাবে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে তাদের সমর্থন থাকা বা না থাকা গুরুত্ব পায় নি। গুরুত্ব পেয়েছে ফরয ইবাদাতের ব্যাপারে তাদের নিষ্ক্রিয়তা, যার ভিত্তিতে তাদের মুনাফিক বল আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ক্বুর'আনে বিভিন্ন

জায়গায় কড়া ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। এ দ্বীন নিষ্ক্রিয়তার দ্বীন না। ইমান থেকে শুরু করে জিহাদ, এ দ্বীনের কোন কিছুই মুখে বুলি আউড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না বরং প্রতিটি বিষয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে দিতে আমরা বাধ্য। অর্থাৎ আমল করতে আমরা আদিষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [আত তাওবাহ, ১৬]

আমরা কি মনে করছি আল্লাহর দ্বীনের বিধিবিধানগুলো ঠুনকো কিছু যখন চাইলাম মানলাম যখন চাইলাম সমর্থনসাপেক্ষে ছেড়ে দিলাম? এমন বিভ্রান্তি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। প্রকৃতপক্ষে এধরনের ব্যক্তির অবস্থান তাই, যে অবস্থা ফরয ত্যাগ কারীর হয়, আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দি শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"...অন্তরগুলো আজ কেবলই দোদুল্যমান এবং যাদের উপর আল্লাহ দয়া করেছেন তারা ব্যতীত সকলেই আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার বদলে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুবকদের বুঝতে হবে যে, জিহাদের সাথে সম্পর্কহীন নেতৃত্বে বড় আকারের ঘাটতি রয়েছে, আর আমাদের এরূপ মানুষদের কথাকে সেভাবেই উল্লেখ করতে হবে যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা উল্লেখ করেছেন। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোন গ্রহনযোগ্য কারণ ব্যতীত জিহাদ না করে বসে রয়েছে, তবে তার অবস্থার বর্ণনা কুরআনে খুবই পরিষ্কার এবং অবশ্যম্ভাবীঃ আর তা হল "ফিসক"। "আর যদি তারা বের হবার ইচ্ছা পোষণ করতো, তবে কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করতো, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, আর তাই তাদেরকে বলা হলঃ 'বসে থাকো তোমরা, যারা বসে থাকে তদের সাথে।'"[সূরা আত-তাওবাহঃ৪৬]

[মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

কোন মুসলিম ভাইয়ের মন কষ্ট দেওয়া, কাউকে ছোট করা আমাদের উদ্দেশ্য না। মুসলিম ভাই হিসেবে প্রতিটি ভাই আমাদের কাছে প্রিয়, আল্লাহ হেদায়েত করুন তাদেরকে এবং আমাদেরকে, আল্লাহ আর রাহমানুর রাহীম একত্রিত করে দিন আমাদের জান্নাতে। মুসলিম ভাই পরিচয়টাই যথেষ্ট, এর বেশি আর কোন পরিচয় নিস্প্রয়োজন। কিন্তু যদি মানহাজের ভাই বলতেই হয় তবে হেলাফেলার সাথে কাউকে বলা সম্ভব না। রক্ত, রিমান্ড,জেল, যুলুমের, বুলেট, ফাসির পথ, আর নিস্তরঙ্গ নিষ্ক্রিয় সমর্থনের পথ এক না। আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারনে ঘর ছাড়া আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না আল্লাহর দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে তালাক দিয়ে দেওয়া আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না দিনের পর দিন রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে সুযোগের অপেক্ষায় আল্লাহর শত্রু ও আমাদের শত্রুদের শিকারী বাঘের মতো অনুসরন করতে থাকা মুজাহিদিনের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারাগারে বন্ধী আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না ঠিক এ কথাগুলো লেখার সময় মুরতাদীনের হাতে রিমান্ডে বন্দী আমাদের ভাইদের কথা; ইয়া আল্লাহ আপনি আপনার এ বান্দাদের হেফাযতকারী হয়ে যান, আপনি তাদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন, আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের হাতে নিহত আমাদের ভাইয়ের কথা যার রক্তের বদলা নেওয়া আমাদের উপর আজ ওয়াজিব, রাহিমাহুল্লাহু ওয়া তা'আলা। এ ভাইরা কোন নির্দিষ্ট ক, খ, গ, তানযীমের হওয়া আবশ্যক না, বরং আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে আহলুস সুন্নাহর অন্তভুক্ত এরকম যতো ভাই আছে, পৃথিবীর যেকোন কোণাতে, তারা সকলেই আমাদের মানহাজের ভাই, এরাই আমাদের রক্তের ভাই। এদের রক্তই আমাদের রক্ত, এদের কষ্টই আমাদের কষ্ট, এদের অশ্রুই আমাদের অশ্রু – হে আল্লাহ আপনি আপনার দুর্বল বান্দাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন সহায় নেই। এসব কিছু ভুলে গিয়ে এসব ত্যাগ তিতিক্ষাকে ভুলে গিয়ে লাইক-কমেন্ট দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকা, সাপ্তাহিক হালাকা আর নিষ্ক্রিয় সমর্থনকে আমরা এক করে ফেলতে পারি না। নিশ্চয় প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলটির মত নয়। নিশ্চয় যে সমুদ্রে ঝড় নেই সে সমুদ্র আমাদের নয়।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে। আল্লাহর

কাছে আশ্রয় চাই হিযবিয়্যাহ থেকে, স্বীয় স্বার্থের কারনে মুসলিমের অন্তরে আঘাত করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হাক্কের উপরে তাঁর সৃষ্টির হাক্ককে প্রাধান্য দেওয়া থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই "পাছে লোকে কি বলে" এ চিন্তায় হাক্ব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, মুজাহিদিনের হাক্কের উপরে মুজাহিদিনের সাথে ওয়ালার উপরে, মুজাহিদিনের বক্তব্যকে তুলে ধরার উপরে, বসে থাকা ব্যক্তিত্বদের স্থান দিতে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, মুহাজির ওয়াল আনসারদের অধিকার বিস্মৃত হওয়া থেকে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাগুতের কারাগারী বন্দী আমাদের শুয়ুখ ও ভাইদের কথা ভুলে যাওয়া থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর দ্বীনের ফারযিয়্যাতের কথা নিছক কসমেটিক ঐক্যের অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া থেকে। আর অতিকঠোরতার অভিযোগ উত্থাপনকারীদের প্রতি জবাব হিসেবে আল ইমাম আল মুজাদ্দি শায়খ উসামা বিন লাদিনের রাহিমাহুল্লাহ এ উক্তিটিই যথেষ্ট-

"যদি একজন ব্যক্তি জিহাদ না করে বসে থাকে এবং রাস্তা থেকে কাঁটা বা তার সদৃশ কোন বাঁধা সড়ানোর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, যেটি কিনা ঈমানেরই একটি প্রশাখা, যখন কিনা অপরদিকে জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফারদ কর্তব্যে পরিণত হয়েছে, তখন তার সেই কর্মের ব্যাপারে এরূপ বলা হবে না যেঃ "আল্লাহ যেন তাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন," বরং, আমাদের দ্বীনের মাঝে সে একটি ফাসিক্ব ব্যক্তি হিসেবেই বিবেচিত হবে, যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-কে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীনকে সাহায্য করার ফারদ/ (বাধ্যতামূলক) কর্তব্য থেকে পলায়ন করেছে।*

সুতরাং, এই প্রধান বিষয়টির ব্যাপারে সচেতন থাকা অতি জরুরী বিষয় যেটির কিছু ব্যতিক্রম স্থান ব্যতীত প্রায় সমগ্র মুসলিম ভূখন্ডেই অনুপস্থিতি আজ সকলের চোখের সামনে সম্পূর্ন স্বচ্ছ।"[মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

ইনশা আল্লাহ চলবে

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩২৬৫

শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জামের ৩০ বছরের দাওয়াতী জিবনের সারসংক্ষেপ ।। মুল্যবান নাসিহাহ

আবু মুহাম্মাদ

Senior Member

১০-০৯-২০১৬

আলহামদুলিল্লাহ, ত্রিশ বিছরের বেশি হবে আমি দাওয়াতের কাজে আছি। দীর্ঘদিনের এই মেহনাত, মুজাহাদা, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার পর আমি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি –

একঃ- যে কোন জিহাদী তানজীম বা ইসলামী রাজনীতি আত্মশুদ্ধি ও নফসকে শুচিশুদ্ধ করার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তার কাঠামো যতই মজবুত হোক না কেন। কারন, দাওয়াতের স্বভাব হল, এ কাজে যারা সম্পৃক্ত, তাদের সে অহংকারী করে তোলে। তার দাওয়াতে নতুন নতুন লোক যোগদানের ফলে তার মধ্যে সাফল্যের অহংকার ভর করে। এমন অবস্থায় যদি দাঈ সে কাজের উপযুক্ত না হয়, তাহলে সে দাওয়াতের জন্য ও ইসলামের জন্য বিপদ হয়ে দাড়ায়। তাই দাওয়াতের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের আত্মশুদ্ধির ব্যপারে সচেতন হওয়া দরকার। নিজেকে ইবাদতের উদ্দ্যেশ্যে নিশি জাগরণে অভস্ত করতে হবে। নফল নামাজ ও রোজায় আন্তরিক হতে হবে।

দুইঃ- যে ব্যক্তি দাওয়াতের কাজে মশগুল রইল, অথচ নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করে নিল না; তার চিন্তার নির্মল প্রস্রবণ ধারায় সে স্বচ্ছ হল না; তার দাওয়াত আল্লহর সন্তুষ্টির জন্য হতে পারে না। আল্লাহর ইবাদাতে সে আন্তরিক নয়। এদের মনে পংকিলতা জমাট বেধে যায়। এরা সকালে উঠে, রাতে ঘুমায়। ইবাদাত আমালের ভাবনা এদের অন্তরে নেই। কোন ইসলামী সংঘঠনের কর্মীদের এমন স্বভাব কাম্য নয়। অমাবস্যার আধারে ঘেরা এমন সংঘঠন ও তার কর্মীদের ভবিষ্যৎ।

তিনঃ- নিজ দল থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হলেই তাকে সমর্থন করবে, পছন্দ করবে। অন্য কোন দল তা করলে পছন্দ হবে না, ভাল লাগবে না। এমন অবস্থায় ইবাদাত প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর জন্য হয় না। বরং দলের জন্য হয়। কেননা, যদি

ইবাদাত আল্লাহর জন্য হত তাহলে যত ভাবে যত পথে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার হত, মন ততই বিমোহিত ও আনন্দিত হত। এক্ষেত্রে যদি তাবলীগ জামাত থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হয়, তাহলে কেন তুমি তা অপছন্দ কর? যদি সালাফীদের থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হয়, তাহলে কেন তুমি তা অপছন্দ কর। সালাফী হয়ে যদি তুমি আল্লাহর জন্যই কাজ করতে, তাহলে তুমি সালাফী ছাড়া অন্য দলের কোন ব্যক্তি হাদীসের কোন ভাল নির্ভরযোগ্য কিতাব রচনা করলে তুমি তা দেখে খুব আনন্দিত হতে। বলতে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এ কিতাব দ্বারা বহু মুসলমানকে উপকৃত করবেন। যুবকদের তুমি তা অধ্যয়নে উৎসাহিত করতে। উদার মনে দল ও মতের উপরে উঠে এ ধরনের আচরণ করা তখনই সম্ভব, যখন কেউ আল্লাহর জন্য সব কিছু করে। যখন কেউ দলমত নির্বিশেষে মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫০১৬